নজরুল-গবেষণা সংকলন

(নজরুল-গবেষণা কেন্দ্র)

সম্পাদক

ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ ঢাকা

নজরুল-গবেষণা সংকলন

(নজরুল-গবেষণা কেন্দ্র)

সম্পাদক

ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহ্‌মান

(২০০৫-২০০৬)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

নজরুল-গবেষণা সংকলন

(২০০৫-২০০৬)

নজরুল-গবেষণা কেন্দ্র, কলা অনুষদ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সভাপতি:
ডক্টর এস. এম. এ. ফায়েজ
উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

পরিচালক:
ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহ্মান
নজরুল-প্রফেসর,
বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মূল্য: পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে : হেরা প্রেস,
৩০২, হেমেন্দ্রদাস রোড, ঢাকা।

প্রকাশকাল - ১৭ই মে, ২০০৭।

নজরুল-গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক, ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহমান কর্তৃক
অস্থায়ী কার্যালয়, ২০০১/ক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. আধুনিক কবিতা ও নজরুল ইসলাম/ শাহাবুদ্দীন আহমদ	৫
২. কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদ-বৈচিত্র্য ও তার মুল্যায়ন/ ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহমান	৪২
৩. নজরুল-প্রবন্ধে নজরুল/ ডক্টর মো. শহীদুর রহমান	১০১
৪. বাঙালা কাব্যে রাসুল (স.) প্রসঙ্গ ও নজরুলের মরু-ভাস্কর/ মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ	১১৫
৫. নজরুল-সঙ্গীতে হাস্যরস ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল	১৪৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আধুনিক কবিতা ও নজরুল ইসলাম

শাহাবুদ্দীন আহমদ*

অগ্রগতি-আকাঙ্ক্ষী মানুষ সর্বদা নতুনকে চায়। কোন নতুন যেহেতু স্থায়ী নয়, সে-জন্য নতুনের পুরাতন হওয়াটা স্বাভাবিক। এই বিবর্তনের পথে ক্রমাবর্তনে 'আধুনিক' শব্দটির উৎপত্তি। এটি ইংরেজী 'মডার্ণ' শব্দের বাঙালা রূপ। বিশ্ব-কাব্য সাহিত্যে শব্দটি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বেশী করে উচ্চারিত হতে শুরু করে। সাহিত্যে বা কাব্যে শব্দটির খুব বেশী তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ শব্দটিকে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। এ ব্যাপারে তাঁর ব্যঙ্গ উক্তি লক্ষ্য করা যায় তাঁর 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

"পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।

> নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাংলায় বলা যাক্ 'আধুনিক'। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।....
>
> ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজী কাব্যে পূর্ববর্তী কালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটিই হ'ল 'আধুনিকতা'।
>
> কিন্তু আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে নব্য

* প্রখ্যাত নজরুল-গবেষক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী।

www.pathagar.com

ভিক্টোরীয় প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরাম কেদারায় শুইয়ে রাখা হ'য়েছে। এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড়, ছাঁটা চুলের খটখটে আধুনিকতা। ক্ষণে ক্ষণে গালে পাউডার, ঠোঁটে রঙ্ লাগানো হয় না তা নয়; কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে উদ্ধৃত অসঙ্কোচে। বলতে চায় মোহ জিনিষটাতে আর কোন দরকার নেই।"

এই উদ্ধৃতিটুকুই হয়ত যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আধুনিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে কী প্রকার বিরূপ ও বিরক্ত ছিলেন—তা দেখাবার জন্য আর একটু উদ্ধৃতি অসঙ্গত ব'লে মনে হবে না। তিনি আরও লিখেছেন—

"আধুনিক কালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জিনিষটা জীবনের চেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে। তাড়া-লাগানো যন্ত্রের ভীড়ের মধ্যেই মানুষের হু হু করে কাজ, হুড়মুড় করে আমোদ-প্রমোদ। যে মানুষ একদিন র'য়ে-ব'সে আপনার সংসারকে আপনার করে সৃষ্টি করত, সে আজ কারখানার উপর বরাত দিয়ে প্রয়োজনের মাপে তড়িঘড়ি একটা সরকারি আদর্শে কাজ চালানো কাণ্ড খাড়া করে তোলে। ভোজ উঠে গেছে, ভোজনটা বাকি। সংগীতের বদলে তার কণ্ঠে শোনা যায়, 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো।' জনতার জগতেই তাকে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হয়, আত্মীয় সম্বন্ধের জগতে নয়। তার চিত্তবৃত্তিটা ব্যস্তবাগীশের চিত্তবৃত্তি। হুড়োহুড়ির মধ্যে অসজ্জিত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই।"

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের কথা বলার ভঙ্গিই বলে দেয় তিনি বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু তাই বলে আধুনিক কাব্য-আন্দোলন থেমে থাকেনি। আসলে আধুনিক কবিতার আন্দোলন ইউরোপে শুরু হ'য়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর "এরিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ত্বে" সাহিত্য বিষয়ক মতবাদের আলোচনা করতে গিয়ে সাহিত্যে বিবর্তনবাদের ক্রম-পরিণতির ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে আধুনিকতার পিঞ্জর খুলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তিনিও বলেছেন—'ইজমগুলির ইতিহাস দেখলেই বোঝা যাবে যে এদের অনেকেরই বয়স খুব বেশী নয়। প্রায়গুলিরই উদ্ভব ঊনবিংশ শতাব্দী; বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীতে।'এ জন্যে তিনি মতবাদগুলোর উদ্ভব এবং নামকরণের পরস্পরের ইতিহাস তুলে ধ'রেছেন । এখানে তিনি ৩১টি মতবাদের নামের উল্লেখ করে তাদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। এদের মধ্যে আছে—১. ফিউচারিজম (১৯০৯); ২. কিউপে ফিউচারিজম (১৯১২); ৩. ইগো ফিউচারিজম (১৯১১); ৪. ডাডাইজম (১৯১৭); ৫, একমিইজম; ৬. এ্যাকটিভিজম (১৯৩৫); ৭. মটোমেটিজম; ৮. ন্যাসোসিয়েশিজনিজম; ৯. ক্লাসিসিজম; ১০. ডাইচাকটাজিম; ১১. একসপ্রেশানিজম; ১২. এগ্‌জিস্‌টেন্‌সিয়ালিজম্‌ (১৯৪৬); ১৩. হিউম্যানিজম; ১৪. নিও হিউম্যানিজম; ১৫. আইডিয়ালিজম; ১৬. ইমোনিজম; ১৭. ইমপ্রেসানিজম; ১৮. নেচারালিজম (১৮৬৮); ১৯. প্রিমিটিভিজম; ২০. র‍্যাশানালিজম; ২১. এ্যান্টি-র‍্যাশানালিজম; ২২. রিয়ালিজম; ২৩. রিজিয়োন্যালিজম; ২৪. রোমান্টিসিজম (১৭৯৮); ২৫. সেন্টিমেন্টালিজম; ২৬. সুররিয়ালিজম; (১৯২৪); ২৭. সিম্বলিজম; (১৮৮৬); ২৮. ট্রানসেনডেন্টালিজম (১৮৮৬); ২৯. আলট্রাইজম; ৩০. ইউন্যানিজম; (১৯০৫-১৯১৪); ৩১. ভার্টিসিজম (১৯১৪) ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য, আর্ট বা শিল্পের দর্শনকে সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাস-দর্শনের সঙ্গেও সম্পৃক্ত ক'রে এই বিশ্লেষণ-চিত্র তুলে ধরা

www.pathagar.com

হ'য়েছে। এটাকে আধুনিক সাহিত্য-ইতিহাসের একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সনাক্তকরণের প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। কিন্তু তাতেই আধুনিকতার বিশুদ্ধ সংজ্ঞা চিহ্নিত হয় না। উপরের ইজমগুলো দেখে মনে হয়, বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে ইতিহাস তুলে ধরেছেন, তা অগ্রগতির ইতিহাস মাত্র—তাতে নতুনত্ব থাকলেও তা বিবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি-চৈতন্যের ইতিহাস; ক্রমাগত খোলস বদলে চির-পরিবর্তিত ধারাক্রম মাত্র। বাঙালা কাব্য-সাহিত্যে এই পরিবর্তিত ধারাক্রমে উজ্জ্বলতমদের প্রথম তিনজন সূর্য-প্রতিম প্রতিভা মধুসূধন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম; বাকী সব এদেরই চতুর্দিকে ঘূর্ণমান গ্রহ-উপগ্রহ মাত্র। তবে এঁদেরকে কতকটা আড়াল ক'রে যে আধুনিক কবিতার আন্দোলন হয়; তারই ব্যাখ্যা দিতে যে সমালোচনার ইতিহাস তৈরী হয়েছে—সেটা উপেক্ষা করার মত নয়। আর এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকভাবে কতকগুলো ধারার যাঁরা নির্মাতা তাঁদের মধ্যে দীপ্তি ত্রিপাঠী অন্যতম। তাঁদের প্রদর্শিত কারণের রূপ প্রমাণ আবু সয়ীদ আইয়ুবকে অনুসরণ করে দীপ্তি ত্রিপাঠী যে পরিকল্পিত ছকটি তুলে ধরেন তা এই—

১. কালের দিক থেকে আধুনিক কবিতা প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী।
২. ভাবের দিক থেকে তা রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসী।
৩. সৃষ্টির দিক থেকে তা নবতম সুরের সাধক।

দীপ্তি ত্রিপাঠী যে লক্ষণগুলি দেখিয়েছিলেন তাৎপর্যপূর্ণ বলে সেগুলিও এখানে দেখানো হলো—

১. নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত;
২. বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ।
৩. আত্মবিরোধ ও অনিকেত মনোভাব।

www.pathagar.com

৪. বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হ'তে সচেতন গ্রহণ।

৫. ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অবচেতন ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে চিন্তাধারার অসম্বদ্ধতা।

৬. ফ্রেজার প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক ও প্ল্যাঙ্ক, বোর, আইনস্টাইন প্রভৃতি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীর প্রভাব।

৭. মার্কসীয় দর্শনের বিশেষতঃ সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির আশা।

৮. মননধর্মিতা—অনেক সময় জ্ঞানের বিপুল ভারে দুরূহতার সৃষ্টি।

৯. বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে (যেমন প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্ম) সংশয় এবং তৎসঞ্জাত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ।

১০. দেহজ কামনা, বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা।

১১. ভগবান এবং প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস।

১২. রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নতুন সৃষ্টির পথ-সন্ধান। ভাবধর্মের সঙ্গে প্রকরণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে আধুনিক কাব্যের প্রকরণেও বহু পরিবর্তন।

এসব কারণে আধুনিক কাব্যের লক্ষণ আলোচনায় আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য সমমর্যাদা দাবী করে। বৈশিষ্ট্যের লক্ষণগুলি এই—

১. বাক্-রীতি ও বাক্য রীতির মিশ্রণ। গদ্যের ভাষা, প্রবাদ, চলতি শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে গদ্য, পদ্য ও কথ্য ভাষার ব্যবধান বিলোপের চেষ্টা, পরবর্তী পর্যায়ে অতি ব্যবহৃত পদ্যগন্ধী শব্দকেও গ্রহণ অর্থাৎ ভাষা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার শুচিবায়ু পরিহার।

২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ এবং বিখ্যাত কবির কাব্য এবং ভাবনা থেকে উদ্ধৃতির যত্রতত্র প্রয়োগে সিদ্ধরীতিকে চূর্ণ করা

www.pathagar.com

বা অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন অনুভূতির সমন্বয় সাধন।

৩.প্রচলিত কবি-প্রসিদ্ধি, উপমা ও বর্ণনার বিরলতম ব্যবহার। প্রচলিত কাব্যিক শব্দ— ছিনু, গেনু, মনে, হিয়া প্রভৃতি বর্জন।

৪. প্রাচীন উপমা বা শব্দের অভিনব অর্থে প্রয়োগ এবং তৎসহযোগে নতুন চিত্রকল্প সৃষ্টি।

৫. শব্দ প্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা বা অর্থঘনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা।

৬. এই মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্যে বাহুল্য বর্জনের ফলে মধ্যবর্তী চরণের অনুল্লেখ। তার জন্য চিন্তাধারার মধ্যে একটা উল্লম্ফনের সৃষ্টি,. আপাতদৃষ্টিতে যাকে মনে হয়—অসম্ভব। ছড়ার উল্লম্ফনের সঙ্গেও তার পার্থক্য মৌলিক।

৭. নাম বাচক বিশেষ্য, বহু পদময় বিশেষণ, অব্যয় এবং ক্রিয়ার পূর্ণ রূপের ব্যবহার। চলতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংস্কৃত বহুল বিশেষ্য বা বিশেষণের সংযোগ।

৮. প্রচলিত পয়ার; সনেট ও মাত্রা প্রধান ছন্দের রূপান্তর এবং মধ্য মিলের (internal rhyme) সৃষ্টি।

৯. গদ্য ছন্দের ব্যবহার।

১০. ব্যঙ্গ, বিতর্ক, অদ্ভুত, বীভৎস রসের বহুল ব্যবহার।

১১. শব্দালঙ্কার অপেক্ষা বিরোধাভাস, বক্রোক্তি, স্মরণ প্রভৃতি অর্থালঙ্কারের ব্যবহার।

১২. বিষয়-বৈচিত্র্য।

দীপ্তি ত্রিপাঠী নজরুল ইসলামকে আধুনিক কবি বলে মনে না করলেও, বিস্ময়করভাবে এই প্রকরণের অনেকগুলো দিকের নির্মাতা ও স্রষ্টা নজরুল ইসলাম নিজেই। সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে না দেখালেও চলে।

প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হ'য়েছে—রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত

www.pathagar.com

তথাকথিত আধুনিকতাকে প্রীতির চোখে দেখেননি। তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা ছিল। তাঁর উক্তি উদ্ধার ক'রে সেটাও দেখানো হ'য়েছে। কিন্তু এখন তাঁর চরম বিদ্রূপাত্মক রসিকতাধর্মী নিম্নোক্ত উক্তির সাহায্যে দেখা যাবে—সে বিরূপতা কতটা নির্মম। তিনি লিখেছেন—

> "এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্যব্যবস্থায় যে ব্যয়-সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সব চেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়; অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা। পাছে অভ্যাসের টানে বাছাই বুদ্ধি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে, এই জন্যে পাঁচিলের উপর দৃঢ় কুশ্রীভাবে ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা। একজন কবি লিখছেন, I am the greatest laugher of all। বলছেন, আমি সবার চেয়ে বড় হাসিয়ে, সূর্যের চেয়ে বড়, শুক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, অ্যাপলো দেবতার চেয়ে। than the frog and Apollo এটা হল ভাষা-কাঁচ। পাছে কেউ মনে করি, মিছে করে সাজিয়ে কথা কইছে। ব্যাঙ না বলে যদি বলা হ'ত সমুদ্র, তাহ'লে এখনকার যুগ আপত্তি করে বলতে পারত, ওটা দস্তুর মত কবিয়ানা। হতে পারে, কিন্তু তারও চেয়ে অনেক বেশী উল্টো ছাঁদের দস্তুর মত কবিয়ানা হ'ল ঐ ব্যাঙের কথা। অর্থাৎ ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া, এইটেই হালের কায়দা।"

এই 'গায়ে প'ড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া' আধুনিক কাব্য-আন্দোলনকে নজরুল ইসলামও প্রীতির চোখে দেখেননি। রবীন্দ্রনাথ

www.pathagar.com

আধুনিক কবিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে না চললেও কবিতার আধুনিক আঙ্গিককে (বাঙালা কবিতায়) পরিহার করেননি। এর উদাহরণ তাঁর লেখা অসংখ্য গদ্য কবিতা। তাঁর 'শেষ সপ্তক', 'পুনশ্চ', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী'—তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু নজরুল সেই বিবেক-অবাঞ্ছিত পথে পা না ফেললেও আধুনিক কবিতাকে ব্যঙ্গ করে একটি গদ্য কবিতা লিখেছিলেন। নজরুলের লেখা 'কবির মুক্তি' আধুনিকী নামক সেই এক মাত্র ব্যঙ্গাত্মক গদ্য কবিতাটা এখানে উদ্ধৃত হ'ল—

"মিলের খিল খুলে গেছে!
কিলবিল করছিল, কাঁচুমাচু হয়েছিল—
কেঁচোর মতন—
পেটের পাঁকে কথার কাতুকুতু!
কথা কি কথক নাচ নাচবে
চৌতালে ধামারে ?
তালতলা দিয়ে যেতে হ'লে
কথাকে যেতে হয় কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে
তালের বাধাকে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে!
এই যাঃ মিল হয়ে গেল!
ও তালতলার কেরদানী—দুত্তোর!
মুর্গী ছানায় চিলের মতন
টেকো মাথায় ঢিলের মতন
পড়বে এই বার কথার বাণ্ডিল।
ছন্দ এবার কন্দ কাটা পাঁঠার মতন ছট্‌ফটাবে।
লটপটাবে লুচির লেচির আটার মতন!
অক্ষর আর যক্ষর টাকার মত
গুনতে হবে না—
অঙ্কলক্ষ্মীর ভয়ে কাব্যলক্ষ্মী থাকতেন
কুঁকড়োর মতন কুঁক্‌ড়ে!

www.pathagar.com

ভাবতেন, মিলের চিল কখন দেবে ঠুক্‌রে!
আবার মিল!—
গঙ্গার দু'ধারে অনেক মিল,
কটন মিল, জুট মিল, পেপার মিল—
মিলের অভাব কি ?
কাব্যলোকে মিল থাকবে কেন?
ওকে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দাও!
ওখানেও যে মিল আছে!
ধুলো যদি কুলোয় যায় চুলোয় যায়,
হুলো ভুলোয় যদি ল্যাজে মাখে!
ল্যাজ কেটে বেঁড়ে করে দেবো।
এঁড়ে দামড়া আছে যে!
আবার মিল আসছে!—মুস্কিল আসান।
অঙ্কলক্ষ্মীকে মানা করেছিলাম,
মিলের শাড়ী কিন্‌তে।
অঙ্কলক্ষ্মীর জ্বালায় পঙ্কলক্ষ্মী পদ্ম
আর ফোটে না!
তা বলতে গেলে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে।
এ কবিতা যদি পড়ে
গায়ে ধানি লঙ্কা ঘষে দেবে!
আজ যে বিনা প্রয়াসেই অনুপ্রাসের
পান পেয়েছি দেখছি!
মিল আসছে—যেন মিলানের মেলায়
মেষের ভিড়!
নাঃ। কবিতা লিখি।
তাকে দেখেছিলাম—আমার মানসীকে
ভেট্‌কি মাছের মত চেহারা।

www.pathagar.com

আমাকে উড়ে বেহারা মনে করেছিল।
শাড়ীর সঙ্গে যেন তার আড়ি।
কাঁখে হাঁড়ি—মাথায় ধামা।
জামা ব্লাউজ সেমিজ পরে না।
দরকারই বা কি?
তরকারী বেচে।
সরকারি ষাঁড়ের মতন নাদুস নুদুস্।
চিচিঙ্গের মতন বেণী দুলছিল!
সে যে-দেশের সে-দেশে আঁচলের চল নাই
চলেন গজ-গমনে!
পায়ে আল্‌তা নাই চালতার রং!
নাম বললে—"আঞ্জুলী",
আমি বলাম—"ধ্যেৎ তুমি কাজলী।"
হাতে চুড়ি নাই,
তুড়ি দেয় আর মুড়ি খায়।
গলায় হার নাই, ব্যাগ আছে।
পায়ে গোদ,
আমি বলি "প্যাগোডা"সুন্দরী!
গান গাই, "ওগো মরমীয়া!"
ও ভুল শোনে! ও গায়
"ওগো বড় মিঞা!"
থাকত হাতে "এয়ার গান!"
ও গায় গেঁয়ো সুরে, চাঁপা ফুল কেয়ার গান—
দাঁতে মিশি, মাঝে মাঝে পিসি বলতে ইচ্ছে করে!
ডাগর মেয়েরা যে আমাকে হাঙর ভাবে।
হৃদয়ে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ!
ভিক্ষা চাই না! শিক্ষা দিয়ে দেবো।

www.pathagar.com

তাই ধরেছি রক্ষাকালীর চেড়িকে।
নেংটির আবার বকেয়া সেলাই!
কবিতা লেখার মসলা পেলেই হ'ল
তা না-ই হ'ল গরম মসলা।
নাঃ, ঘুম আসছে,
রান্না ঘরের ধুম আসছে।
বৌ বলে, নাক ডাকছে,
না শাঁখ ডাকছে।
আবার মিল আসছে—
ঘুম আসছে—
দুম্বা ভেড়ার দুম্, আসছে!

আধুনিক কবিতা নিয়ে নজরুলের এই ব্যঙ্গ খানিকটা বিস্মিত করে। কেননা যে নজরুল হুইটম্যানের একজন ভক্ত ছিলেন, যিনি প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ; তিনি এভাবে রক্ষণশীলতাকে কেন প্রশ্রয় দিলেন। হুইটম্যানের কাব্য অনুরণনে তিনি O Pioneers -এর অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন—

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত
গিরিগুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।

এবং হুইটম্যানের পক্ষ নিয়ে যিনি ইব্রাহীম খাঁর কাছে লেখা চিঠিতে বলেন—

> "সকল সমালোচনার উপরে যে-বেদনা, তাকে নিয়েও আর্ট শালা রক্ষী—এই প্রাণহীন আনন্দ গুণ্ডার কুশ্রী চিৎকারে হুইট্‌ম্যানের মত ঋষিকেও অ-কবির দলে পড়তে হয়েছিল।"

তবে কি নজরুল মিল ও ছন্দ-বদ্ধ কবিতাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন? উল্লেখ্য গদ্যছন্দে লেখা কবিতাকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও

www.pathagar.com

কবিতা বলতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। এ-জন্যে হুইটম্যানকে যথার্থ কবি বলতে তাঁর আপত্তি ছিল। শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় 'সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় লিখেছেন—

> "আমেরিকার হুইটম্যান ও লংফেলোকে তিনি কবি বলে মানতেন না। তিনি বলতেন—"ওদের দেশের দু'টি ত মাত্র কবি, এক জনের ছন্দমিল জুটেছিল ত' ভাব জোটে নি, অপরের ভাব জুটেছিল ত' ছন্দ মিল জোটে নি।"

হুইটম্যানের কবিতা সম্বন্ধে এ- ধরনের উক্তি নজরুল করেননি। কিন্তু নজরুল কবিতার ছন্দের প্রতি যে কত গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন সেটা বোঝা যায় O Pioneers -এর "অগ্রপথিক" শীর্ষনামে তাঁর অনুবাদ দেখে। Prose verse-এ লেখা O Pioneers - এর তিনি মার্চের ছন্দে অনুবাদ করেন।

বাঙালা কবিতায় যাঁরা হুইটম্যানকে অনুবাদ করেছেন সেই প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সৈয়দ আলী আহসান কিন্তু হুইটম্যানকে গদ্যেই অনুবাদ করেছেন। অনুমান করা অন্যায় নয় যে, হুইটম্যানের প্রোজ ভার্স বা গদ্য কবিতা রবীন্দ্রনাথকে গদ্য কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নজরুল ইসলামের "ব্যথার দান", "রিক্তের বেদন"-এর গদ্যকে কিন্তু মাঝে মাঝে গদ্য কবিতা বলতে ইচ্ছা হয়। যা হোক বাংলা ভাষায় গদ্য ছন্দে কবিতা রচনাকে নজরুল ইসলাম মেনে নিতে পারেননি। এখানে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উত্তরসূরী। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের শিষ্যত্বকে উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করলেও সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে গদ্য ছন্দে কবিতা লিখতে দেখা যায় না। এ দিক থেকে সুধীন দত্তকে সত্যেন দত্তের শিষ্য বলতে দ্বিধা জাগে না।

যাহোক, নজরুল ইসলাম তথাকথিত আধুনিক কবিতা না লিখলেও আধুনিক কবিতাকে আধুনিক বলে সংজ্ঞায়িত করার

www.pathagar.com

প্রবক্তাদের কারণগুলির ভিত্তিতে ভাব, আঙ্গিক, ও প্রকরণের অনেক বৈশিষ্ট্য যে নজরুলের মধ্যে লক্ষ্যযোগ্য—এখন সেই কথাই বলা হবে। প্রথমে **প্রকরণ** সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। দীপ্তি ত্রিপাঠী আধুনিক কবিতার প্রকরণ-চরিত্রের যে-তালিকা দিয়েছেন, তার প্রথমটিতে আছে "গদ্যের ভাষা, প্রবাদ, চলতি শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে গদ্য, পদ্য ও কথ্য ভাষার ব্যবধান-বিলোপের চেষ্টা ।"

মদীয় 'শব্দ ধানুকী নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে দেখানো হ'য়েছে—নজরুল বাঙালা কবিতায় কী পরিমাণ প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। সেখানে 'ছেলের হাতের মোয়া', 'চিনির বলদ', 'ঢাক ঢাক আর গুড় গুড়', 'ধামা-ধরা', 'বিনা মেঘে বজ্রপাত', 'নানা মুনির নানা মত', 'খোদার উপর খোদ্‌কারী', 'চাঁদের হাট', 'ভিক্ষার চাল কাঁড়াই হোক আর আকাড়া', 'ছেলের চাইতে পিলে বড়' এই সব প্রবাদের ব্যবহার দেখানো হ'য়েছে।

নজরুলের কবিতায় বিদেশী শব্দের ব্যবহার নিয়ে এখানে পুনরালোচনার প্রয়োজন নেই। তাঁর আরবী, ফারছী শব্দের ব্যবহার ত প্রবাদ-প্রতীম। লোকজ ও দেশী শব্দের ব্যবহারেও তিনি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় কম যাননি।

ত্রিপাঠীর দ্বিতীয় বক্তব্যে ছিল আধুনিক কবিতায় পুরাণ ব্যবহারের কথা। এ-ব্যাপারে বাঙালা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম নিজের তুলনা নিজে। তাঁর কবিতায় তিনি হিন্দু-পুরাণ এত ব্যবহার করেছেন যা আধুনিক-অনাধুনিক কোন হিন্দু কবিও ব্যবহার করতে পেরেছেন ব'লে জানা যায় না—মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথসহ।

বলা যেতে পারে, একমাত্র গদ্য কবিতা লেখা ছাড়া, কথ্য ভাষায় সরল 'অক্ষর বৃত্তে'র মিশ্রণে সংলাপ ধর্মী ভাষার ছন্দে ছাড়া আধুনিক কবিতা রচনার সব দাবী তিনি মিটিয়েছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মত তাঁর কবিতায় সাধু ভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়ত একটু বেশী

www.pathagar.com

আছে। আর সেই সঙ্গে ছিনু, গেনু, হিয়া ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার। তবে বিরোধাভাস, বক্রোক্তি, স্মরণ ইত্যাদির ব্যবহারও নজরুল প্রথম দেখান। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যে লিখেছিলেন—'তাঁর ভাষা-রীতির মধ্যে কোথাও দেখা গেল না, রবীন্দ্রপ্রতিভার বিন্দুমাত্র প্রভাবের লক্ষণ' সেটাই প্রমাণ করে যে, **নতুন প্রকরণ সৃষ্টির আধুনিকতা নজরুলের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে**। নব্য আধুনিকতাবাদীরা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের 'প্রাজ্ঞ' 'সজ্ঞান চেষ্টা'য় যেটা করতে চেয়েছিলেন, নজরুল সহজাত প্রতিভার শক্তিতে সেটা করেছেন অনায়াসে। এটা কি করে সম্ভব হয়েছে তার উত্তরে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বলেছেন, 'মানুষের মস্তিষ্কের সকল চেষ্টার বাইরে যে রহস্যময় শক্তি দৈবধনের মত শুধু দু'একটি চিহ্নিত ভাগ্যবানকে দেয়—তার নিগূঢ় রহস্য-মন্ত্রের দুর্লভ দীক্ষা, নজরুল এ-যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে সেই রহস্যময় দুর্লভ শক্তির প্রসাদ।' দীপ্তি ত্রিপাঠী বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেন নি। অনুদারতার অনুবীক্ষণ ব্যবহার না করলে তিনিও ব্যাপারটি বুঝতে পারতেন এবং তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়'-এও নজরুল ইসলামকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য ক'রতে পারতেন না। তাঁর পরিশ্রমপৃক্ত রচনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করেও কথাটা বলা চলে।

কিন্তু বাংলা কবিতায় নজরুলের আধুনিক চিন্তার অবদান শুধু প্রকরণ নয়, **বিষয়-ভাবনাতেও**। এখন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় বক্তব্য পেশ করা হবে। আসলে, কবির কাজ শুধু শব্দ-ব্যবহারের চাতুর্য, ছন্দ-নির্মাণের কৌশল ও দক্ষতা, উপমা, চিত্রকল্প, সৃষ্টির অভিনবত্বে নিহিত থাকে না; তারও চেয়ে বেশী কিছু থাকা চাই—সেটা তার চিন্তাদর্শনে ব্যক্ত হয়। শব্দ, ছন্দ, উপমা, চিত্রকল্প, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার কবির ঐ চিন্তাদর্শনকে চিত্তদ্রবীভূতকারী দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি বিমোহনকারী উপাদান মাত্র। সেটা না হ'লে ১৯২৯-এ এ্যালবার্ট হলে তাঁকে অভিনন্দন জানানোর পরে জবাবী ভাষণে তিনি আত্মসমালোচনা করে বলতেন না—

www.pathagar.com

"আমি শক্তি-সুন্দর, রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠ্‌তে পারি নি।"

বিশের দশকে সাহিত্য-শিল্পে ও কাব্য-শিল্পে তিনি কি অবদান রেখেছেন তা জেনেও তিনি নিজেকে সমালোচনা করে যে কথা বলেছেন তাতেই বোঝা যায় অলঙ্কার শাস্ত্রের দাবী মেটানোর মধ্যেই কবির দায়িত্ব শেষ হ'য়ে যায় না। ত্রিশ দশকের নজরুলের অনেকগুলি কবিতা ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নজরুল সেই দায়িত্ব সম্পূর্ণ করার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। বোধ হয় এ বিষয়টি উপলব্ধি করেই কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আবদুল কাদিরকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন—

"আমি তাকে যত বড় দেখতে চেয়েছিলেম তার চেয়েও সে অনেক, অনেক বড় হ'য়েছে।"

ষাটের দশকে অনুজ-বন্ধু সম্বন্ধে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের এই লেখা কি প্রমাণ করে না, নজরুলের আত্মসমালোচনা মূলক উক্ত ভাষণ সত্য ছিল—যে, 'আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পরি নি।' প্রথম, মহাযুদ্ধের পরে লেখা 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'ছায়ানট', 'ভাঙ্গার গান', 'জিঞ্জির', 'দোলন চাঁপা', 'সন্ধ্যা', 'চন্দ্রবিন্দু', 'প্রলয়-শিখা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক' প্রভৃতি গ্রন্থে নজরুল যে অসামান্য শিল্প-সুন্দর কাব্য সৃষ্টি করে 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' হ'য়ে উঠেছিলেন এবং যার জন্যে তাঁকে বাঙালী জাতির তরফ থেকে সম্বর্ধনা দিয়ে অভিনন্দন-পত্রে বলা হ'য়েছিল—'তুমি বাঙালীর ক্ষীণকণ্ঠে, মূর্ছাতুর প্রাণে অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়াছ', 'তুমি বাঙালার মধুবনের শ্যামা কোয়েলার কণ্ঠে ইরানের গুলবাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ', 'বাঙালীর শ্যামশান্ত কণ্ঠে ইরানী সাকীর লাল-শিরাজীর আবেশ-বিহ্বলতা দান করিয়াছ'; 'ভবিষ্যতের ঋষি তুমি', 'চিরঞ্জীব-মনীষী তুমি' সে-সব কথা কাব্য বিচারের শেষ কথা নয় বলে; নজরুল বলতে পেরেছিলেন, 'আমি শক্তি-সুন্দর, রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারিনি।' মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নজরুলকে যত বড় দেখতে

www.pathagar.com

চেয়েছিলেন ১৯২৯-এর অভিনন্দন পত্রে সেই বড়ত্বটিকে দেখানো হ'য়েছে। কিন্তু তার চেয়েও যে নজরুল বড় হয়েছিলেন—সেটা নজরুল দেখিয়েছেন ত্রিশের দশকের কাব্য ও সঙ্গীত রচনায়। সে সম্বন্ধে এখনও কোন পূর্ণ—সার্থক আলোচনা করা হয়নি। আর এখানেই রয়ে গেছে নজরুলের চিন্তাদর্শনের বিষয়গত দিক—শুধু প্রকরণ আলোচনা এবং তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে নজরুল-চিন্তা বা নজরুল-মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হবে না।

এ-সম্বন্ধে "বোদলেয়ার থেকে এলিয়ট ও বাংলা কবিতা"-পুস্তকে বারীন্দ্র বসুর বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি মানুষের দেবতা-ঈশ্বর প্রভৃতি ধর্মীয় মতবাদী দর্শন অতিক্রম করে মানব-শক্তির উত্থান মতবাদী দর্শন-কেন্দ্রিক সাহিত্য বা কাব্যকে আধুনিক কাব্য ও সাহিত্য বলে অভিহিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর দর্শন-বিজ্ঞান মানুষকে ঈশ্বর-বিমুখ মানবশক্তিকে প্রধান বলে শনাক্ত করে। তখন মানুষ ভাবতে থাকে 'সে সর্ব শক্তিধর; ঈশ্বর বা অদৃষ্টে বিশ্বাস স্থাপন অর্থহীন; অভাবনীয় কিছু ঘটে না, যুক্তি দ্বারাই সব কিছু বিচার্য, সকল কার্যই উপযুক্ত কারণ সম্ভূত, মানুষই সর্বশক্তিমান—'একমেব দ্বিতীয়ম্'। এই মানব-সর্বস্বতাই এ-যুগের শিল্প-সাহিত্যে প্রধান স্থান নিল। দেববাদ-নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ যখন পরিপূর্ণ মানব-সর্বস্বতাকে গ্রহণ করল জীবন- দৃষ্টিরূপে, তখন-ই সৃষ্টি হ'ল আধুনিক যুগের। এই যুগের জীবন, জীবন-দৃষ্টি; চিন্তা ও চেতনা যে-সাহিত্যে ব্যক্ত হ'ল, তাই-ই হ'ল আধুনিক সাহিত্য।'

এটা সত্য হ'লে **বাঙালা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক কবিতা বলতে হবে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাকে**। যদিও নজরুল তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতায় লিখেছিলেন—"গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান'; কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতাতেই তিনি মানুষের ঈশ্বর-সত্তা ও পুরুষোত্তম সত্তার জয় গান গেয়েছিলেন। সেখানে তিনি শুধু বলেননি—

www.pathagar.com

"আমি মৃন্ময় আমি চিন্ময়
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়
আমি মানব দানব দেবতার ভয়
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়
জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি
এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য।"

ব'লেছিলেন—

"আমি মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতৃর
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর!"

এতে নজরুল প্রমাণ করেন মানুষ সর্বশক্তিমান হয়ত বা ঈশ্বর তুল্য। মানুষের ক্ষমতার এই জয়গান রবীন্দ্রনাথ গাইতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে সুলতান মাহমুদ মজুমদার তাঁর "ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি" পুস্তকে লিখেছেন—

"এখন বলছি, রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-ভারতীতে বসে তাঁর সুর-ভাণ্ডারী দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে 'বিদ্রোহী' ও নজরুল সম্বন্ধে কি বলেছিলেন। ..... বলেছিলেন, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা আমার 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাকে ছাপিয়ে গেছে। সে আজ বাংলা সাহিত্যের মুক্ত আকাশতলে স্বীয় ক্ষমতায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। কেউ তাকে আর রুখতে পারবে না। 'বিদ্রোহী' কবিতা নজরুলকে অপরাজেয় করে রাখবে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় আমি শুধু পাষাণ কারা ভাঙতে চেয়েছিলাম, তাই বলেছিলাম—

www.pathagar.com

ওরে চারিদিকে মোর
একি কারাগার ঘোর,
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা আঘাতে আঘাত কর।

কিন্তু নজরুল শুধু কারা ভাঙায় সন্তুষ্ট হ'তে পারে নি। সে তার 'বিদ্রোহী' কবিতায় স্বয়ং ভগবানের আসন ছাড়িয়ে, আরও অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে।"

বারীন্দ্র বসু মানুষের আত্ম-চৈতন্য জাগৃতির জন্যে মানুষের যে সর্বশক্তিমান হওয়াকে তার সাহিত্যের নব রূপায়ণ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেটাই নজরুলেরও বাঙালা সাহিত্যে ও কাব্যে নব অবদান ও আধুনিকতা। বস্তুতঃ নজরুল-ই যে প্রথম 'রবীন্দ্রনাথের মায়াজালা' ভেঙেছিলেন—বুদ্ধদেব বসুর এই উক্তি-ই প্রমাণ করে নজরুল বাঙালা কাব্যের প্রথম আধুনিক কবি।

আরও কথা তিনি শুধু মানুষের জয়গান গান নি—মনুষ্যত্বের ও মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর সাহিত্যে ও কাব্যে শ্রেণী-নির্বশেষে সকল মানুষই মানুষের মর্যাদা পেয়েছে। এই প্রথম আল্লাহ্-বন্দনা, ঈশ্বর-বন্দনা, দেবতা-বন্দনা, ফেরেশতা-বন্দনার পাশাপাশি সর্বকালের সর্বজাতির সর্বশ্রেণীর মানব-বন্দনা ঠাঁই পেয়েছে। **মানুষকে তিনি মহিমার এমন উচ্চ স্তরে ঠাঁই দিয়েছেন যে গীর্জা, প্যাগোডা, মসজিদ, মন্দির তার মর্যাদাকে অতিক্রম করতে পারেনি**। এটা তাঁর হৃদয়োত্থিত বা হৃদয়-নিঃসৃত বাণী না হ'লে তিনি লিখতে পারতেন না—

তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
এই একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।

পারশ্যের দু'একজন কবি ছাড়া এত বড় মহৎ বাণী বিশ্বের আর কোন দেশের কোন কবি উচ্চারণ করেছেন বলে জানা যায় না। পবিত্র গ্রন্থ বলতে—'কোরান, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, ত্রিপিটক' এবং

www.pathagar.com

ভজনালয় বলতে মছজিদ, মন্দির, গীর্জা-প্যাগোডা ইত্যাদি বোঝায়, কিন্তু মানুষ এ-সবের চেয়ে পবিত্র—নির্দ্বিধায়, নিঃসঙ্কেচে নজরুল সে-কথা ঘোষণা করেছেন। কেননা নজরুলকে আল্ কুরআনুল করীম-ই শিখিয়েছে—'আল্লাহ্ ফিরিশ্তাদের আদম বা মানুষকে ছিজ্দা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে সেই আদমকে ছিজদা করেনি—সেই হয়েছিল ইবলিছ বা শয়তান। এই মহত্তম সৃষ্টি যে, সকল সৃষ্টির সেরা হবে—তাতে সন্দেহ কি? তাহ'লে সে কি মর্যাদায়—পবিত্রতায় সর্বশ্রেষ্ঠ নয়? **মানুষের এই মহিমাকীর্তন 'বিদ্রোহী' কবিতায় বিদ্যমান ব'লে 'বিদ্রোহী' কবিতা শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিতাও। আর এই কবিতার কবি—শুধু শ্রেষ্ঠ কবি নন—শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিও।**

২.

নজরুল ইসলামের আধুনিকতাকে বুঝতে হ'লে রেনেসাঁসের স্বরূপকে বুঝতে হবে। আজ বিশ্বে যে-আধুনিকতাকে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে; তা রেনেসাঁসের অবদান। সে-জন্যেই আধুনিকতা ও রেনেসাঁস শব্দ দু'টিকে পৃথক করে নয়—একাত্ম করে দেখা উচিত। আর তা দেখলে আধুনিকতাবাদীরা আধুনিক শব্দের যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন তাকে পুনর্ভাবনার অর্গলে আটকাতে হবে। মানুষের মঙ্গলের জন্যে বিশ্বমনীষা যে-চিন্তা করেছে, তার সব কিছুকে নিখুঁত বর্জ্য বস্তু হিসাবে পরিত্যাগ করেনি রেনেসাঁস। রেনেসাঁস চেয়েছিল মানবতাকে উদ্ধার করতে মানুষের স্বভাবজাত সৌন্দর্য প্রীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। নজরুল ইসলামই বোধ করি প্রথম বাংলা সাহিত্য ও কাব্যে মানুষের এই মনস্কামনাকে অকুণ্ঠভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তাঁর-ধর্ম ছাড়া অন্যের ধর্মের মানুষের শুভ ও কল্যাণ মূলক উপদেশকেও তিনি বর্জ্য বস্তু হিসাবে ছুঁড়ে ফেলেননি, এক-ই সঙ্গে নিজ ধর্মের তিনি পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। এ বিষয়ে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর নজরুল-মূল্যায়ন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। তিনি তাঁর "নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

ও রিনেসাঁস" প্রবন্ধে লিখেছেন—

> "সংস্কৃতির এই শীতের দেশে হঠাৎ এলেন নজরুল ইসলাম বসন্তের মত্ততার মতো। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রিনেসাঁসের আগমন হ'ল—বুদ্ধি, অনুভূতি ও কল্পনার দ্বার খুলে গিয়ে মানব-মহিমা উপলব্ধ হল। তাঁর 'বিদ্রোহী' মানব মহিমারই কাব্য। বন্ধন-জর্জর মানবাত্মার যন্ত্রণা এখানে বিদ্রোহের বেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঁচবার স্বাদ আমরা প্রথমে নজরুলের কাব্য থেকেই পাই। জীবনের নিয়ামক যে জীবন নিজেই, আর কিছু নয়, শাস্ত্র-সংহিতা সেখানে শুধু মন্ত্রণা দিতে আসতে পারে, এ-বোধ সর্বপ্রথমে নজরুলের কাব্য থেকেই আমরা লাভ করি। জীবনের আগ্রহে জীবনের প্রতিকূল আইনকে আসন দিতে তিনি চাননি; তাকে বন্ধনের রজ্জু বলেই মনে করতেন। যে প্রচলিত নীতি-বিরোধিতা রেনেসাঁসের একটি বড় লক্ষণ, তা নজরুলের জীবনে ও কাব্যে সুপ্রচুর।"

মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর "রিনেসাঁস-এর গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি" প্রবন্ধে এক-ই কথা বলেছেন নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে। রবীন্দ্র-ভক্ত হ'য়েও এ-কথা তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেন নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথও রেনেসাঁসের উপমা ছিলেন। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ নজরুলের বীর্যশালিতা রবীন্দ্রনাথে ছিল না এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু-জাগরণের অগ্রপথিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে জুড়ে দিলেও তাঁর সীমাবদ্ধতাকে রেনেসাঁসের ঔদার্যের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা সম্ভব হবে না। এমনকি আমরা যখন রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি—**'জাতির-জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল**। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতি নাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি।' তখন

www.pathagar.com

বোঝাই যায়—যথার্থ রিনেসাঁস কার মাধ্যমে বাঙালা সাহিত্যে উন্মোচিত হয়েছিল।

বস্তুতঃ নজরুল ইসলামই প্রথম—শুধু মানুষের; নিপীড়িত মানুষের জয়গান গাননি, তিনি জীবন ও যৌবনের জয়গান গেয়েছিলেন। তিনি শুধু পরাধীনতার শিকল ভাঙার গান গাননি; জড়ত্বের, বৃদ্ধত্বের, শাস্ত্রের, আইনের, বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত স্বার্থপরতার এবং জীবন বিমুখ সংস্কারবদ্ধতারও শিকল ভাঙার গানও গেয়েছিলেন। এটাই যথার্থ মানবতার মুক্তি-সংগ্রাম। এটাই সত্যিকার আধুনিকতা। এই আধুনিক চেতনা শেলী ও হুইটম্যানে ছিল বলে এঁদের এবং এঁদেরও পূর্বসূরী ওমর খৈয়ামকে আধুনিক কবিতার প্রথম জনক বলে চিহ্নিত করা যায়। তাই বিশ্ব-সাহিত্য-ইতিহাসের প্রথম আধুনিক কবি বোদলেয়ার নন—ওমর খৈয়াম। হয়ত' এ কারণেই তিনি ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের অনুবাদে আগ্রহী এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। নজরুলের "ওমরের কাব্য ও দর্শন" প্রবন্ধে যে আধুনিক মানুষের জিজ্ঞাসার প্রশ্ন তোলা হ'য়েছে—সে-জিজ্ঞাসা সাম্প্রতিক কালের মানুষের। আধুনিক কবিরা (যাঁরা তথাকথিত আধুনিক কবি বলে পরিচিত) সেই রহস্যের স্বরূপ—তাঁদের কবিতায় এককভাবে কেউ তুলে ধরতে পেরেছেন বলে মনে করা যায় না।

বলা প্রয়োজন—মানুষের মনস্কামনা নিশ্ছিদ্র শান্তি। সেই লক্ষ্যে মানুষের সমস্ত সংগ্রাম নেতিবাচক কোন চিন্তা হ'তে পারে না। চক্রাকারে আবর্তিত মানব-সমাজের সৃষ্টি, ধ্বংস ও পুনর্সৃষ্টির ধারাক্রমের ইতিহাস যে আজও শেষ হয় নি, সে-কথা বলাই বাহুল্য। যাঁরা বিজ্ঞানী এবং যাঁরা আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, এই মুহূর্তে বিশ্বের শেষ হওয়া বা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও—তার লক্ষ কোটি বৎসর টিকে থাকার সম্ভাবনাও উপেক্ষা করার মত নয়। দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর "আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়" গ্রন্থে আধুনিক কাব্যের যে লক্ষণগুলোর তালিকা দিয়েছেন

www.pathagar.com

সেই ক্লান্তি, হতাশা, নৈরাশ্যবোধ, আত্মবিরোধ ও অনিকেত বোধ মানুষের সহস্র সহস্র বছরের পিছনের ইতিহাসেও ছিল। আর ছিল বলে সে উপলব্ধি ও অনুভূতির উপস্থিতি কাব্যে অলক্ষ্য নয়। ওমর-হাফিজের কবিতায় দারুণ নৈরাশ্যের সুর। অতএব তারও পূর্বের মানব-ইতিহাসে, নিপীড়িত মানব সমাজের দুঃখ-বেদনা-নৈরাজ্য থাকবে না—তা নয়। সেটা ছিল; এবং তা ছিল বলেই প্রতিবাদ, যুদ্ধ ছিল। বিষয়টা নজরুলের দৃষ্টি এড়ায়নি। ইব্‌রাহীম খাঁর কাছে লেখা চিঠিতে তাই নজরুলকে লিখতে দেখা যায়—"এমন এক যুগ ছিল—সে সত্যযুগ হবে হয়ত, যখন মানুষের দুঃখ আজকের মত এত বিপুল হ'য়ে ওঠেনি। তখন মানুষের নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে ধ্যানের তপোবনে শান্ত সামগান গাইবার অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু যেই মাত্র মানুষ নিপীড়িত হতে লাগল, অমানি সৃষ্টি হ'ল বেদনার মহাকাব্য—রামায়ণ মহাভারত, ইলিয়াড প্রভৃতি।"

এই প্রতিবাদী বা যুদ্ধের কাব্যের ইতিহাস তাই আজকের নয়। সুতরাং যুদ্ধকাব্য হ'লে তা আধুনিক কাব্য বা কবিতা হবে না—এ ধরনের মতবাদ হাস্যকর বলে বিবেচিত হবে। নজরুল ইসলাম যুদ্ধের কাব্য হিসাবে রামায়ণ, মহাভারত, ইউলিয়াডের উদাহরণ দিয়েছেন; তিনি 'অস্-বউল মুঅল্লকাত'-এর, ফেরদৌসীর 'শাহ্‌নামা'রও উদাহরণ দিতে পারতেন।

আররী কাব্যে এই যুদ্ধ ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সে যুদ্ধ প্রধানতঃ মৌলিক প্রতিহিংসা, গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনকে নিয়ে ঘটত। সে সময়কার বা তার পূর্বেকার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ধর্ম, জাতি ও নারী-প্রেমের জন্যেও অসংখ্য যুদ্ধ হয়েছে এবং প্রধান কাব্যে তার অভিব্যক্তি ঘটেছে। আমাদের পুঁথিকাব্যেও যেমন সে যুদ্ধ-বর্ণনা আছে, তেমনি আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও কায়কোবাদের কাব্যে সেই যুদ্ধকে লক্ষ্য করা যায়। আংশিকভাবে হ'লেও সে যুদ্ধের কবিতা প্রায় শান্ত রসের কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও

www.pathagar.com

বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের 'কথা'-কাব্যের 'বন্দীবীর' কবিতায় ও "নৈবেদ্যে"র কোন কোন কবিতায় বীর রসের পর্দা উন্মোচন সূক্ষ্ম-পাঠক-দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে না। কবিতায় তিনি রাজনীতির নগ্ন উন্মোচনের পক্ষপাতী না হ'লেও তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন এমন অসত্য স্বীকার্য নয়। সে জন্যেই যুদ্ধ আধুনিকতা নয় এবং যুদ্ধ-বিরোধিতা আধুনিকতা; এই ধারণা কি-ভাবে যৌক্তিক হ'তে পারে! নজরুল ইসলামকে 'বসন্ত' নাটিকা উৎসর্গ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের বিতর্ক-নাটকটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হ'তে পারে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "কবি-স্বীকৃতি" প্রবন্ধে লেখা রবীন্দ্র-ভাষ্যে বলা হ'য়েছে—

> "নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গ-পত্রে তাকে কবি বলে অভিহিত করেছি। জানি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পারনি। আমার বিশ্বাস, তারা; নজরুলের কবিতা না-পড়েই এই মনোভাব পোষণ করছে। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করেনি। অবজ্ঞা ভরে চোখ বুলিয়েছে মাত্র।
>
> 'মার, মার, কাট্ কাট্ ও অসির ঝন ঝনার মধ্যে রূপ ও রসের প্রক্ষেপটুকুও হারিয়ে গেছে'—উপস্থিত একজন মন্তব্য করলেন।
>
> "কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না, এও তোমাদের অদ্ভুত আব্দার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে বাঁধা, অসির ঝন ঝনায় যখন সেখানে ঝংকার তোলে, ঐকতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করতে হবে বৈকি! আমি যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও এই সুর বাজত।"

www.pathagar.com

'কিন্তু তার রূপ হ'ত ভিন্ন'—আর একজনের মন্তব্য শোনা গেল।

"দু'জনের প্রকাশ ত দু'রকম হবেই, কিন্তু তা বলে আমারটা নজরুলের চেয়ে ভালো হ'ত, এমন কথাই বা জোর করে বলবে কি করে!"

'যাই বলুন, এ অসির ঝন্ ঝনা জাতির মনের আবেগে ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নজরুলী কাব্যের জনপ্রিয়তাও মিলিয়ে যাবে'—মন্তব্য এলো ফরাস থেকে।

"জনপ্রিয়তা কাব্য বিচারের স্থায়ী নিরিখ নয়, কিন্তু যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য।"

সবাই চুপচাপ। প্রসঙ্গান্তর তুলে কবি জানতে চাইলেন, আমি কবে যাব নজরুলের কাছে। আমি জানালাম বুধবারে আমার ইন্টারভিউর দিন।

কে যেন দু' কপি 'বসন্ত' এনে দিল কবির হাতে। তিনি একখানায় নিজের নাম দস্তখত করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—"তাকে বোলো আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জোগাবার কবিও ত চাই।"

যুদ্ধকে সমর্থন না করলে যে, রবীন্দ্রনাথ এ-কথা বলতেন না; তা বলাই বাহুল্য। অন্যায় ও উৎপীড়ন-বিরোধী যুদ্ধে, মসির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বলেই 'ধূমকেতু'র নজরুলকে আহ্বান ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"আয় চলে আয় রে, ধুমকেতু

www.pathagar.com

আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।"

সুতরাং যুগ-প্রার্থিত লেখাকে যুদ্ধ-কবিতা ব'লে—আধুনিক না বলার মধ্যে কোন যুক্তি নেই।

প্রথম মহাযুদ্ধের তাণ্ডব ও দাবদাহে ক্লান্ত পাশ্চাত্য কবিদের সুরে সুর মিলিয়ে জীবনানন্দ দাস লিখেছিলেন—

"জানিতে চাহি না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোনখানে
কোথায় নতুন করে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয়!
আমার চোখের পাশে আনিও না
সৈন্যদের মশালের আতসের রং
দামামা থামায়ে দে
পেঁচার পাখার গন্ধে উড়ে যাক
রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ্।"

প্রতিতুলনায় দেখা যাবে, ইতঃপূর্বে যুদ্ধকে দীপ্যমান করতে নজরুল ইসলাম লিখেছেন—

"আস্তানা সিধা রাস্তা নয়
আজাদী মেলে না পস্তানোয়
দস্তা নয় সে সস্তা নয়!"

অথবা—

"ওরে আয়!
তোর ভাই ম্লান চোখে চায়
মরি লজ্জায়,
ওরে সব যায়,
তবু কব্জায় তোর শমশের নাহি কাঁপে আফসোসে

www.pathagar.com

হায়?
রণ-দুন্দুভি
শুনি খুন-খুবী
নাহি নাচে কি রে তোর মরদের ওরে
দিলীরের গোর্দায়?"

সাধারণভাবে যুদ্ধ না-করাটা মানবতা; কিন্তু নিজের জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করাটা আরও বড় মানবতা। সুতরাং যুদ্ধের মধ্যে বর্বরতা দেখে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াটা আধুনিকতা হ'লে মর্যাদা রক্ষার জন্যে আত্মরক্ষার যুদ্ধ আধুনিকতা নয় কেন?

বস্তুতঃ 'যুদ্ধ'—মানব-নিয়তি। মানুষ যখন বেহেশ্‌ত-চ্যুত হ'য়েছে তখন-ই তাকে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে টিকে থাকার চেষ্টায় রত হ'তে হ'য়েছে। সুখ ও শান্তি মানুষের কাম্য হ'তে পারে, কিন্তু দুঃখ ও অশান্তি তার স্থায়ী জীবন-সঙ্গী। আর এর-ই নদী-সাগরে সাঁতরানো জীবন-নিয়তি। মানুষকে সৃষ্টি করা হ'য়েছে ইন্দ্রিয়ের দাস করে। প্রতি মুহূর্তে যে ইন্দ্রিয়-কামনার সঙ্গে মানুষকে লড়তে হচ্ছে, সে ইন্দ্রিয়-কামনা জীবনের উৎস। লোভ, লিপ্সা, কামনা, বাসনা আছে বলে জীবনের অস্তিত্ব। মানুষের কাজ এটাকে নিয়ন্ত্রিত সীমার মধ্যে বন্দী রাখা। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ এ-সবের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে পাশবিকতা থেকে আত্মরক্ষা করতে। সে জন্যেই যুদ্ধের শেষ নেই। মানুষের এই উপলব্ধি কোন বিশেষ কালের নয়—চিরকালের।

জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন—

"যেখানে চিন্তা উদ্যম কাজ
সেখানেই সূর্য-পৃথিবী বৃহস্পতি
শত শত শূকরের চিৎকার সেখানে
শত শত শূকরের প্রসব বেদনার আড়ম্বর
এই সব ভয়াবহ আরতি।

www.pathagar.com

গভীর আন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে
আমার আত্মা লালিত
আমাকে কেন জাগাতে চাও
হে সূর্য, হে সময়গ্রন্থি; হে মাঘনিশীথের কোকিল
হে স্মৃতি, হে মহাত্রয়া আমাকে জাগাতে চাও কেন?"

অথবা সুধীন্দ্রনাথের এই লেখা—

"আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই"।

বা—

"মৃত্যু কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা
যাতনা কেবল যাতনা সুচির সাথী!"

এটা ব্যক্তির স্বোপলব্ধির কথা। এর মধ্যে আধুনিকতার কোন ব্যাপার নেই। মানব-সমাজের রাষ্ট্রচিন্তা-দর্শনের পরিবর্তনে এবং রাষ্ট্রের ইতিহাস-পরিবর্তনে যে অভিজ্ঞতার উদ্ভব ঘটে এবং তা থেকে যে চিন্তা-দর্শন তার অভিঘাত কাব্যেও পড়ে। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব-সমাজ-দর্শনে যার উদ্ভব ঘটেছিল, মার্কসের মাধ্যমে তা বিশ্ব-মনীষাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। দ্বান্দ্বিক বস্তবাদের সে-দর্শন নজরুলের কবিতায় মর্মরিত হ'তে দেখা যায়। নজরুলের 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু', 'রক্তাম্বর ধারিণী মা', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা' ও 'প্রলয় শিখা'তে সে বস্তুবাদী দর্শনের ছায়াপাত ঘটেনি তা নয়; কিন্তু তা সার্বিকভাবে সমাজতন্ত্রের অন্ততঃ মার্কসের সমাজতন্ত্র ব'লে সবাই স্বীকার করবেন না। নজরুলের কবিতায় নিপীড়িত মানব-সমাজের হ'য়ে যে সমবেদনা লক্ষ্য করা যায়, যে ধ্বংস-সৃষ্টির কথা আছে; তা যেমন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কথা, তেমনি শেলীর প্রকৃতি দর্শনের কথাও। তাঁর কবিতায় যেমন মার্কসীয় দর্শনের সাম্যবাদের কথা আছে, তেমনি আছে ইছলামী সাম্যবাদের কথা। তিনি যেমন লিখেছেন—

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—প্রলয় নূতন সৃজন বেদন!
আসছে নবীন জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন?

www.pathagar.com

তাই সে এমন কেশে-বেশে
প্রলয় ব'য়েও আসছে হেসে
মধুর হেসে!
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!"

তেমনি তিনি বলেছেন—

"আজি ইসলামী ডঙ্কা গরজে ভরি' জাহান,
নাই বড়-ছোট সকল মানুষ এক সমান,
রাজা প্রজা নয় কারো কেহ।
কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায়?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি; জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ ॥

ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুখ সম-ভাগ করে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের!
কারো আঁখিজলে কারো ঝাড়ে কি রে জ্বলিবে দীপ,
দু'জনের হবে বুলন্দ নসীব, লাখে লাখে হবে বদনসিব?
এ নহে বিধান ইসলামের ॥"

প্রথম উদ্ধৃতিতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অস্তিত্ব দেখা যায়, দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে আছে ইছলামী সাম্যবাদের চেতনা-দর্শন।

"রবি শশী তারা প্রভাত-সন্ধ্যা তোমার আদেশ কহে—
এই দিবারাতি আকাশ-বাতাস নহে একা কারো নহে।
এই ধরণীর যাহা সম্বল—
বাসে ভরা ফুল রসে ভরা ফল
সুস্নিগ্ধ মাটি, সুধাসম জল, পাখীর কণ্ঠে গান,
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর 'ফরমান'।"

www.pathagar.com

ইছলামের মত মার্কসীয় এবং গ্রীক ধ্যান-ধারণায় এই অধিকারের কথা রূপ পেয়েছিল। নব বিশ্বে মার্কস এই যে চেতনার জন্ম দেন সেটি ইছলামীয় অধিকার চেতনার চেয়ে ভিন্ন ছিল না। সে-জন্যেই উভয় চিন্তা-দর্শন সম্বন্ধে অবহিত নজরুল বলেছিলেন—

> "আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলির যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায়, তবে বেশ বুঝা যায় যে, সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে।"

কিন্তু একটা বিষয়ে নজরুল মার্কসীয় মতবাদকে মেনে নিতে পারেননি। সেটা হ'ল মার্কসীয় নিরীশ্বরবাদ তাঁর বিখ্যাত "ভাঙার গান" কবিতায় যেমন তিনি বলেছিলেন—

> "হা হা হা পায় যে হাসি,
> ভগবান প'রবে ফাঁসি?
> সর্বনাশী
> শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?"

তেমনি তাঁর "রাজবন্দীর জবানবন্দী" প্রবন্ধে তিনি বলতে দ্বিধা করেননি—

> "আমি ভগবানের হাতে বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙবে কে?"

এক-ই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—

> "আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত।"

অতএব সাম্যবাদী চেতনায় সম্পৃক্ত হলেও তিনি সেই দর্শনের

www.pathagar.com

সঙ্গে অন্যমত ছিলেন; যেখানে আল্লাহর অস্তিত্বকে অমান্য করা হ'য়েছে।

তাঁর কবি-জীবনের শেষ দিকে এই বিশ্বাসের চেতনাকে তিনি সুস্পষ্টরূপে রূপায়ণ করেন। "এক আল্লাহ জিন্দাবাদ" কবিতায় তিনি লেখেন—

"উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ;
আমরা বলিব, "সাম্য, শান্তি, এক আল্লাহ জিন্দাবাদ।"

আল্লাহ-বিরোধী অবিশ্বাসীদের প্রতি তিনি আক্রমণাত্মক উক্তি করতেও দ্বিধা করেননি। তাই ওই কবি্তায় তিনি বলেছেন—

"মানুষের অনাগত কল্যাণে উহারা চির-অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসীরাই শয়তানী-চেলা ভ্রান্ত দ্রষ্টা ভুল-ভাষী।
ওরা বলে, হবে নাস্তিক সব মানুষ, করিবে হানাহানি।
মোরা বলি হবে আস্তিক, হবে আল্লাহ মানুষে জানাজানি।"

"বিশ্বাস ও আশা' কবিতায় নজরুল ইসলাম তাঁর বিশ্বাসী দর্শনকে অটুট করে তুলেছেন। বোঝা যায়, তাঁর চিত্তে মার্কসীয় দর্শনের সামান্য অবস্থানের অংশটুকুকে তিনি উৎখাত করতে চান। বলা প্রয়োজন, স্বাধীনতা-আন্দোলনে সোচ্চার নজরুলের প্রথম জীবনে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে সন্ত্রাসী (টেরোরিস্ট)দের সহযোগিতা ছিল। ঐ সময় তাঁর বন্ধুদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন তিনি কমিউনিস্ট মুজফফর আহমদ। মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে থাকাকালীন তিনি বিদ্রোহী কবিতা লিখেছিলেন। এরপরে তিনি 'ধূমকেতু' প্রকাশ করেন। তখন সে-পত্রিকার মতাদর্শের সঙ্গে তিনি সমগ্র রাজনৈতিক সংগ্রামীদের সমর্থন পান। তারপর দেখা যায়, তিনি 'লাঙল" পত্রিকার পরিচালক হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছেন। এ-সময়ে তিনি যেমন 'সাম্যবাদী' কবিতা লেখেন; তেমনি লেখেন সর্বহারার কবিতা। শুরুটা নজরুলের হয়েছিল ইসলামী ভাবাদর্শগত কবিতা দিয়ে। ক্রমে তাঁর চিন্তা সম্প্রসারতা লাভ করে।

www.pathagar.com

এই উল্লম্ফনে তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তা এবং ইরানী বা পারসী কবিদের গণতান্ত্রিক উদার চিন্তাধারার সংমিশ্রণ ঘটে। কিন্তু তাঁর মধ্যে আল্লাহ্‌বাদী ইসলামী চিন্তা ও ইসলামী সাম্যবাদী চিন্তা ওতপ্রোতভাবে উজ্জীবিত থাকে। সে-জন্যেই বিশের দশকের মধ্য ভাগে তিনি "জিঞ্জীর"-এর 'সুবহে উম্মীদ', 'খালেদ', 'ঈদ মুবারক' প্রভৃতি কবিতা লিখতে সমর্থ হন। নজরুল ইসলাম প্রথম থেকেই কখনও এককভাবে কোন দলে সম্পূর্ণভাবে আত্মসর্ম্পণ করেননি। এ-জন্যেই তিনি একক কোন দল বা মতাদর্শের সমর্থক থাকেন নি। একারণে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দলের সমালোচনার সম্মুখীন হন। যে-জন্য 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় তিনি লেখেন—

"আন্ কোরা যত নন্ ভায়োলেন্ট নন্‌কোর দলও নন খুশী
ভায়োলেন্সের ভায়োলিন নাকি আমি বিপ্লবী মন তুষি।
এটা অহিংস বিপ্লবী ভাবে
নয় চরকার গান কেন গাবে?
গোঁড়া রাম ভাবে নাস্তিক আমি, পাতি রাম ভাবে কনফুসি।
স্বরাজীরা ভাবে নারাজি, নারাজি ভাবে তাহাদের অংকুশি!"

তাঁর প্রথম জীবনের এই চিন্তাদর্শের একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন "নজরুল-রচনাবলী" প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কবি আবদুল কাদির। তিনি লিখেছেন—

"নজরুলের দেশাত্মবোধের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা নানা জনে নানাভাবে করেছেন। রাজনীতিক পরাধীনতা ও অর্থনীতিক পরবশতা থেকে তিনি দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তি চেয়েছিলেন; তার পথও তিনি নির্দেশ করেছিলেন। সেদিনের তাঁর সেই পথকে কেউ ভেবেছেন সন্ত্রাসবাদ; কারণ তিনি ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের উদাহরণ দিয়ে তরুণদের অগ্নিমন্ত্রে

www.pathagar.com

আহ্বান করেছিলেন; কেউ ভেবেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিয়ম-তান্ত্রিকতা; কারণ তিনি 'চিত্তনামা' লিখেছিলেন; কেউ ভেবেছেন প্যান ইসলামিজম—কারণ তিনি আনোয়ার পাশার প্রশস্তি গেয়েছিলেন; আবার কেউ ভেবেছিলেন মহাত্মা গান্ধীর চরকা-তত্ত্ব—কারণ তিনি গান্ধীজীকে তাঁর রচিত 'চরকার গান' শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছিলেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এ-সব ভাবনার কোনটাই সত্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ উদ্ঘাটনের সহায় নয়। প্রকৃতপক্ষে নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে ছিলেন কামাল-পন্থী,—কামাল আতাতুর্কের সুশৃঙ্খল সংগ্রামের পথই তিনি ভেবেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সর্বাপেক্ষা সমীচীন পথ।"

কমিউনিজম যে, সীমাবদ্ধতার মধ্যে নজরুলকে আটকাতে পারেনি, সে-কথা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আবদুল কাদিরকে লেখা চিঠিতে স্বীকার করেছেন—

"আমি যে অনধিকার চর্চা করেছি তার জন্যে আমার মনে কোন খেদ নেই। নজরুল যে আমার সঙ্গে রাজনীতিতে টিকে রইল না, সে যে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে; তার জন্যে অবশ্য আমার খেদের অন্ত নেই। যদিও আমি বহু দীর্ঘ বৎসর অনুপস্থিত ছিলেম তবুও আমার মনে হয় আমি হেরে গেছি।"

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের এই 'হেরে যাওয়া' খুব স্বাভাবিক ছিল। কারণ তিনি নজরুলকে তাঁর মত ক'রে যে গ'ড়তে চেয়েছিলেন—

www.pathagar.com

সেটাই ছিল তাঁর ভুল। সূর্য চাঁদকে আলোকিত করে। চাঁদ সূর্যকে আলোকিত করে না। যে ইসলামী আদর্শ ও দর্শনে নজরুল গ্রস্ত ছিলেন; কমিউনিজমের আদর্শ তার থেকে বড় ছিল না। সে জন্যেই নজরুলের পক্ষে কমিউনিজমের মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া সম্ভব ছিল না। আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে নজরুল তাঁর "আমার লীগ কংগ্রেসে" ব'লেছেন—"আল্লাহ্ আমার প্রভু, রসুলের আমি উম্মত, আল্ কোরান আমার পথ প্রদর্শক।" এবং এটা ব'লেই তিনি প্রমাণ ক'রেছেন তিনি বিশ্বাসীদরে-ই একজন। তাঁর 'বিশ্বাস ও আশা' কবিতায় ইসলাম ও কমিউনিজম এই দুই মতাদর্শের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিংশ শতাব্দীতে, ত্রিশ-পরবর্তী বিশ্বে এবং উপমহাদেশে কমিউনিজমের বাজার ছিল রমরমা। তারা অবিশ্বাসের সঙ্গে নিরন্নবাদিতা ও নৈরাশ্যের ভয়ঙ্কর সুর ছড়িয়ে দিচ্ছিল গোটা বিশ্বে। "এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদে" সে-কথা ব'লে তিনি আল্লাহ্র জয়গান গেয়েছেন। 'বিশ্বাস ও আশা'য় তিনি আশার জয়গান গেয়েছেন। একজন নিরন্নবাদী নৈরাশ্যের গান গাইতে পারে—একজন আল্লাহ্বাদী তা পারে না। দুর্বল শক্তি মানুষ আল্লাহ-আশ্রয়ী; আশার শক্তি নিয়ে সে বেঁচে থাকে। আর এ-কথা কে না জানে বিশ্বাসীরা কখনও নিরাশাবাদী হ'তে পারে না। তারা সুধীন দত্তের মত ব'লতে পারে না—'আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই।' বা 'যাতনা কেবল যাতনা সুচির সাথী'। অথবা জীবনান্দ দাশের মত ব'লতে পারে না—'গভীর ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত/ আমাকে কেন জাগাতে চাও!' আল্লাহ্বাদী, বিশ্বাসী, জীবনবাদী ও জীবনমুখী নজরুল তাই লেখেন—

"বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেয়ো না তাহার কাছে
নড়াচড়া করে তবুও সে মড়া, জ্যান্তে সে মরিয়াছে।
শয়তান তারে শেষ করিয়াছে ঈমান ল'য়েছে কেড়ে,
পরান গিয়েছে মৃত্যুপুরীতে ভয়ে তার দেহ ছেড়ে।
থাকুক অভাব দারিদ্র্য ঋণ রোগ শোক লাঞ্ছনা,

www.pathagar.com

যুদ্ধ না ক'রে তাহাদের সাথে নিরাশায় মরিওনা।
ভিতরে শত্রু ভয়ের ভ্রান্তি, মিথ্যা ও অহেতুক
নিরাশায় হয় পরাজয় যার, তাহার নিত্য দুখ।"

এই 'আশা' ও 'আশ্বাস'-এর কথা তিনি তাঁর 'ডুবিবে না আশাতরী' কবিতাতেও ব্যক্ত ক'রেছেন। এই বিশ্বাসীর আশা আছে ব'লে তিনি রোমান্টিক; আধুনিক নন—এ-কথা যথার্থ-যুক্তির তর্কে টেকে না। যে বোদলেয়ারকে আধুনিক কবিতার জনক বলা হ'ত তিনিও ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। অন্তরঙ্গ ডায়েরীতে (বুদ্ধদেব-অনূদিত ল্য ফ্ল্যর দু' মান'—'ক্লেদজ কুসুম' থেকে নেয়া) বোদলেয়ার লিখছেন—'প্রতি প্রভাতে প্রার্থনা ভগবানের কাছে, যিনি সব ক্ষমতা ও সুবিচারের উৎস.....তাঁরা যেন আমার জন্য দৌত্য করেন, শক্তি দেন আমাকে।' এক-ই ঈশ্বরবাদী চিন্তা এলিয়টের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম যুদ্ধোত্তর ইউরোপে বা পাশ্চাত্যের জীবন-প্রবাহে যে ধূসর নৈরাশ্য উৎপন্ন হ'য়েছিল; সেটাই ছিল টি. এস. এলিয়টের কবিতার বিষয়। সভ্যতার শুভ্রতা ও 'রক্তশূন্যতা'র ভয়াবহ চারিত্র্যরূপ নিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেন। যার ফলে তার কবিতায় এই বিশ্ব-পরিবেশের রূপ ফুটে ওঠে এই ভাষায়—

Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water.....

সেই এলিয়ট ক্রমেই হ'য়ে উঠেন ধার্মিক খৃষ্টান এবং মনে করেন—খৃষ্টধর্মেই হবে মানুষের মুক্তি। Ash Wednesdayতে কবি এই অভিমত ব্যক্ত ক'রেছেন। রবীন্দ্র বসু তাঁর—"বোদলেয়ার থেকে এলিয়ট ও বাংলা"-শীর্ষক গ্রন্থে ব'লেছেন—

"সমকালীন ক্ষয়গ্রস্ত জাগতিক প্রেক্ষাপটের দুঃসহ

www.pathagar.com

পীড়নে আর্ত কবি খৃষ্টান ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে শেষ
পর্যন্ত আশা ও মুক্তি অন্বেষণ ক'রছেন।"

নজরুল ইসলামের আল্লাহ-বিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাস প্রায় নিশ্ছিদ্র ছিল তা সুনিশ্চিত। তাঁর প্রথম সাহিত্য-জীবনে লেখা কবিতা এবং গোধূলি-জীবনের কাব্য তার সুস্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। তা বোঝা যায়, তাঁর প্রথম জীবনের লেখার এই সব উচ্চারণে—'আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী', 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ চিহ্ন'; 'আমি স্রষ্টা-সূদন শোক-তাপ-হানা খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন', 'স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু', 'ঈশ্বর শির উল্লঙ্ঘিতে আমি আগুনের সিঁড়ি', 'আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি, আমি এমনি শক্তিমান!, 'মম চরণের তলে মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান !' ইত্যাদি পংক্তিতে। তাঁর শেষের সাহিত্য-জীবনে লেখা কবিতা 'বিশ্বাস ও আশা', 'ডুবিবে না আশা তরী', 'সকল পথের বন্ধু', 'তোমারে ভিক্ষা দাও', 'বকরীদ', 'আল্লাহ্‌র রাহে ভিক্ষা দাও', 'একি আল্লাহ্‌র কৃপা নয়', 'এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ', 'চিরনির্ভয়', 'আল্লাহ্ পরম প্রিয়তম মোর', 'চির-নির্ভয়' প্রভৃতি কবিতাও তাঁকে নিরন্ধ্র অন্ধ ধর্মপ্রীতিতে নিমজ্জিত হ'তে দেখা যায় না। তাহ'লে তিনি লিখতেন না 'গোঁড়ামি ধর্ম নয়'-এর মত কবিতা। সে-কবিতায় তিনি লিখেছিলেন—

"শুধু গুণ্ডামী ভণ্ডামী আর গোঁড়ামী ধর্ম নয়,
এই গোঁড়াদেরে সর্বশাস্ত্রে শয়তান কে না কয়।
এক সে স্রষ্টা সব সৃষ্টির এক সে পরম প্রভু,
একের আধা স্রষ্টা কোনো সে ধর্ম কহে না কভু।
তবু অজ্ঞানে যদি শয়তানে শরীকী স্বত্ব আনে,
তার সে বিচারক এক সে আল্লা লিখিত আল-কোরানে।"

বিশ দশকের মধ্যকালে তিনি তাঁর কাব্যে শুধু সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কবিতা লেখেননি; 'বারাঙ্গনা',

www.pathagar.com

'নারী', 'জাগরণ' প্রভৃতি কবিতায় তিনি হুইটম্যানীয় চিন্তাসমৃদ্ধ কবিতা লিখে, হুইটম্যানের অনুরণনে 'অগ্রপথিক' কবিতা লিখে এবং 'জিঞ্জীর'-এর 'নওরোজ' ও 'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়' কবিতা লিখে—প্রমাণ ক'রেছিলেন, তিনি উদার চিত্তের গণতন্ত্রবাদী প্রগতিশীল চিন্তাধারার কবি। নজরুলের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির "সিন্ধু-হিন্দোল" কাব্যের 'সিন্ধু', 'অনামিকা','বাসন্তী', 'ফাল্গুনী', 'মাধবী প্রলাপ', 'দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর' প্রভৃতি কবিতায় আধুনিক মনন এবং ফ্রয়েডীয় চিন্তারও সুরধ্বনি অন্তঃশীলা হ'য়ে প্রবাহিত। নজরুলের "সন্ধ্যা" কাব্যে জীবন ও যৌবন-বন্দনার সঙ্গে আছে বিজ্ঞান-বন্দনা। আর বিজ্ঞান যদি আধুনিক কবিতার অন্যতম বিষয় হয়, তাহলে নজরুলের কবিতায় তার স্থান হওয়াটা কালের বাস্তবতা। বলাই বাহুল্য নজরুলের কবিতায় রাজনীতি আছে বলে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে যে কাব্য-রসমণ্ডিত তিরস্কার পেয়েছিলেন, সে রাজনীতি সুনিশ্চিতভাবে কবির কাছে কালের দাবী। রাজনৈতিক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি 'যুগের মন'-এর প্রতিফলন ঘ'টিয়েছিলেন। সেটাই ত সত্যিকার আধুনিকতা।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

১. দেখুন, বিশ্বনাথ দে-সম্পাদিত। নজরুল-স্মৃতি, (কলিকাতা-১৯৮৭), পৃষ্ঠা ২০২।
২. সুশীল কুমার গুপ্ত। নজরুল চরিত-মানস, (কলিকাতা-১৩৭০), পৃষ্ঠা-৪৯।
৩. দেখুন, রফিকুল ইসলাম। নজরুল-জীবনী, (ঢাকা-১৯৭২), পৃষ্ঠা ৭-৮।
৪. এস. এম. লুৎফর রহমান। নজরুল ইসলামের ইমামতি, মোল্লাকী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, দৈনিক বাংলা,
(২৫. ৯. ৯২), শুক্রবারের সাহিত্য-সংখ্যা।
৫. কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল-রচনাবলী-৩য় খণ্ড, (ঢাকা-১৯৭০), পৃষ্ঠা-৯৯। আবদুল-কাদির-
সম্পাদিত।
৬. দেখুন ক) সুশীল কুমার গুপ্ত। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮।
খ) রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০-৩১।
৭. কাজী নজরুল ইসলাম। ন. র. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০১।
৮. ঐ, ন. র., পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০১।
৯. ঐ, ন. র. চতুর্থ খণ্ড, (ঢাকা-১৯৭৭), পৃষ্ঠা-২৯১। আবদুল কাদির-সম্পাদিত।
১০. ঐ, ন. র., ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৫। আরজ।
১১. মাহ্‌ফুজুর রহমান খান। নজরুলের কাব্য-আমপারার অন্তরালে, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ৫ম
বর্ষ, গ্রীষ্ম,-১৩৮৩। পৃষ্ঠা-৮০-৯২।
১২. সুশীলকুমার গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩৭।

www.pathagar.com

কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদ-বৈচিত্র্য ও তার মূল্যায়ন

ডক্টর. এস. এম. লুৎফর রহমান*

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে, বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন—তা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হ'য়েছে। ঐ আলোচনা থেকে জানা গিয়েছে যে, তিনি কম-ছে-কম আটটি ভাষার একটি থেকে অপরটিতে অনুবাদ ক'রেছেন। সেই ভাষাগুলো হ'ল—১. আরবী, ২. ফারছী, ৩. পশ্তু ৪. উরদু ৫. হিন্দী ৬. সংস্কৃত, ৭. ইংরেজী ও ৮. বাঙালা। কবি এ-সব ভাষা যে, ভালভাবে জানতেন—তাও পূর্বে—আলোচনা করা হ'য়েছে।

এবার দেখানো হবে—এ-সব ভাষায় বা ভাষা থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলাম কি কি অনুবাদ ক'রেছেন; আর সে-সব অনুবাদের সাথে অপরাপর অনুবাদকের—অনুবাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ কেমন।

এ-দিক থেকে আগে, কবি—উপরে-কথিত আটটি ভাষা থেকে কি কি অনুবাদ বা তরজমা ক'রেছেন—তার একটি মোখ্তছর (সংক্ষিপ্ত) পরিচয় দেওয়া হবে। তারপর, তুলনা করা হবে, সে-সব রচনার সাথে; অন্যান্য কবিরও ঐ সব রচনা—অনুবাদের।

১. আরবী ভাষা থেকে অনুবাদ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, আরবী ভাষা থেকে বাঙালায় অনুবাদ করেন—আল্ কোরআনের "আম্পারা" অংশটি। তাঁর ইচ্ছা ছিল—গোটা কোরআনুল করীমের তরজমা করা। এ-বিষয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন—"আমার জীবনের সব চেয়ে বড় সাধ ছিল পবিত্র

* পরিচালক, নজরুল-গবেষণা কেন্দ্র এবং নজরুল-প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢা.বি.।

www.pathagar.com

"কোর-আন" শরীফের বাঙ্‌লা পদ্যানুবাদ করা। সময় ও জ্ঞানের অভাবে এতদিন তা ক'রে উঠতে পারিনি। বহু বৎসরের সাধনার পর খোদার অনুগ্রহে অন্ততঃ প'ড়ে বুঝবার মতও আরবী-ফারছী ভাষা আয়ত্ত ক'রতে পেরেছি ব'লে নিজেকে ধন্য মনে ক'রছি।

কোর-আন শরীফের মত মহাগ্রন্থের অনুবাদ ক'রতে, আমি কখনো সাহস ক'রতাম না, বা তা করবারও দরকার হ'ত না—যদি আরবী ও বাঙ্‌লা ভাষায় সমান অভিজ্ঞ কোন যোগ্য ব্যক্তি এদিকে অবহিত হ'তেন।" কবির এ-বয়ান থেকে বোঝা যায়; তিনি বাঙালা ভাষার মতই আরবী ভাষাজ্ঞানও অর্জন করেন। উভয় ভাষাতেই তাঁর সমান দক্ষতা অর্জিত হওয়ায়, তিনি বাঙালা ভাষায় কোরআন অনুবাদে সাহসী হন।

কিন্তু তিনি তাঁর ইরাদা শেষ তক পূরণ ক'রে যেতে পারেননি। সারা 'কোরআন' মজীদ তরজমা করার কাজ তিনি শেষ ক'রতে সমর্থ হননি।

এ-বিষয়ে তাই তাঁর তরজমা—একটাই মাত্র হ'লেও, ইয়াদ করা জরুরী যে, কবি আরবী ভাষা থেকে আম্‌পারা—তরজমার মধ্য দিয়ে কেবলমুছলমানদের জন্য ধর্মীয় বিষয়বস্তু ও তত্ত্বকথাই—বাঙালা ভাষার মুছলিম পাঠকদের সওগাত রূপে এনে হাজির করেননি। কবি সেই সাথে মুছলিম-অমুছলিম—সকল বাঙালী কবি- লেখক-ছড়াকারদের জন্য আরবী ভাষার নানা রকম ছন্দও বাঙালায় রূপ দান ক'রেছেন। আমপারা অনুবাদের সাথে ছন্দানুবাদের কথাও মনে রাখা দরকার। এর মূল্যও কম নয়। কারণ, যে-কোন ভাষার কবিতা বা গদ্যের অনুবাদ অপেক্ষা, ঐ ভাষার নানা রকম ছন্দের অনুবাদ বেশী কঠিন; বেশী দূরূহ বৈ কি!

২. ফারছী ভাষা থেকে অনুবাদ

ফারছী ভাষা থেকে নজরুল ইসলাম অনুবাদ করেন—রুবাই, কবিতা ও গজল। এ-ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, মহাকবি হাফিজ-এর 'দিউয়ান'

www.pathagar.com

থেকে গজল, কবিতা; ওমর খৈয়াম-এর—রুবাই ও রুমীর—'মস্‌নভী'র একটি কবিতা অনুবাদ করেন। হাফিজের গজল গ্রন্থ—"দিউয়ান-ই হাফিজ" তিনি অনুবাদ করেন এবং এধরনের আর একটি পূর্ণ অনুবাদ কবি ওমর খৈয়ামের—"রোবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম"। নজরুল ইসলাম এছাড়া আর কোন ফারছী কাব্য পুরো অনুবাদ করেছেন ব'লে জানা যায় না। নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবির অনুবাদ-রচনার তালিকা নিম্নরূপ—

১. আশায় /হাফিজ /প্রবাসী/পৌষ–১৩২৬।
২. প্রিয়ার দেওয়া শরাব/ হাফিজ/বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা/ বৈশাখ–১৩২৭।
৩. বোধন/হাফিজ/ মোসলেম ভারত/ জ্যৈষ্ঠ-১৩২৭।
৪. বাদল প্রাতের শারাব/ হাফিজ/ মোসলেম ভারত/ আষাঢ়–১৩২৭।
৫. বাঁশীর ব্যথা/রুমী/বঙ্গনূর/ কার্তিক-১৩২৭।
৬. ৬টি গজল (দিউয়ান থেকে) / হাফিজ/ মোসলেম ভারত/ অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ-১৩২৭।
৭. ৭টি গজল (দিউয়ান থেকে)/ হাফিজ/ প্রবাসী/ বৈশাখ-শ্রাবণ-১৩৩০।
৮. ৮টি গজল /হাফিজ/ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা/ বৈশাখ-১৩৩০।
৯. ৯টি গজল / হাফিজ/ কল্লোল/পৌষ–১৩৩৪।
১০. ১০ টি রুবাই/ হাফিজ/ কল্লোল/পৌষ-১৩৩৭।
১১. শাখ-ই-নবাত/হাফিজ/সওগাত/আষাঢ়-১৩৩৭।
১২. ৫৯ টি রুবাই/ওমর খৈয়াম/ মোহাম্মদী/কার্তিক-অগ্রাহয়ণ ও পৌষ-১৩৪০।

এই তালিকা থেকে দেখা যায়, কবি ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত—ফারছী থেকে অনুবাদ অব্যাহত রাখেন। এর-ই মধ্যে তাঁর

www.pathagar.com

পূর্বোক্ত "কাব্য আমপারা"-গ্রন্থও আরবী থেকে ভাষান্তরিত হয়—বাঙালায়। কবি ইরানী (ফারছী) গজলের সুর, ছন্দ, ভাব এবং ভাষাও বাঙালায় রূপদান করেন।

৩. পশ্‌তু ভাষা থেকে অনুবাদ

পশতু ভাষা থেকে কবির একটি মাত্র কবিতার অনুবাদ একালের হাতে এসে পৌঁছেছে। এ-কবিতার মূল রচয়িতৃ পশ্‌তু ভাষার বিখ্যাত পাঞ্জাবী কবি খুশ্‌হাল খান খটকের স্ত্রী। নজরুল ইসলাম এই মহিলার একটি কবিতা "বিরহ-বিধুরা" নামে অনুবাদ করেন এবং সেটি প্রকাশিত হয়—"মোসলেম ভারত"-পত্রিকার ১৩২৭ সালের মাঘ সংখ্যায়।

কবি নজরুল ইসলাম যখন 'বাঙালী পল্টনে' ছিলেন—তখন-ই সম্ভবতঃ পাঞ্জাবী সৈনিকদের নিকট থেকে পশ্‌তু ভাষা শেখেন এবং এ-ছাড়া আর কোন কবিতা অনুবাদ করেছেন কিনা—তা জানা যায় না। পশ্‌তু ভাষার সুর ও ছন্দ তিনি বাঙালায় এনেছেন কিনা, সে-বিষয়ে গবেষণা করার দরকার আছে।

৪. উর্দু ভাষা থেকে অনুবাদ

উরদু ভাষা থেকে— কবি সরাসরি কিছু অনুবাদ ক'রেছেন বলে জানা যায়নি। তবে, এ-তরফে মশহুর উরদু কবি হালির রচনার অনুসরণে লিখিত, কবি নজরুলের কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করা যায়। উরদুতে কবিতা ও গান রচনা ছাড়াও স্বরচিত অনেক বাঙালা গানের উরদু তরজমা ক'রেছেন কবি । কবির "সুর ও শ্রুতি" সংগীতবিদ্ রাজা নওয়াব আলী চৌধুরীর "মারিফুন্নাগমাত" নামক একটি উরদু গ্রন্থানুসরণে রচিত ব'লে কেউ কেউ মনে করেন। তবে, রচনাটি উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ নয়।

৫. হিন্দী ভাষা থেকে অনুবাদ

হিন্দী ভাষার সঙ্গেও কবির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য থেকে কতটা উপাদান সরাসরি গ্রহণ ক'রেছেন, তা জানা না

www.pathagar.com

গেলেও, নিজের অনেক গান তিনি হিন্দী জবানীতে তরজমা ক'রেছেন—তা ইদানীং জানা গেছে। হিন্দী ভাষার সুর ও ছন্দের অনুবাদও তার রচনায় বিদ্যমান। হিন্দীতে তিনি গান, গীতি-নাট্য ও চিত্রনাট্য লিখলেও; ঐ ভাষা থেকে সরাসরি কিছু তরজমা ক'রেছেন কিনা বলা কঠিন।

৬. সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ

সংস্কৃত ভাষা থেকেও কবির অল্প কিছু অনুবাদের নিদর্শন মেলে। পূর্বোক্ত সংগীতালোচনামূলক রচনা 'সুরু ও শ্রুতি'তে তিনি কয়েক খানি সংস্কৃতে রচিত সংগীত-গ্রন্থের উল্লেখ ক'রেছেন। তাছাড়া, সংস্কৃত নানা ছন্দ তিনি বাঙালা ভাষায় প্রবর্তন করেন। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জনাব আবদুল মান্নান সৈয়দ— "নজরুল ইসলাম; কবি ও কবিতা" শীর্ষক গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনা ক'রেছেন। কবি যে-সংস্কৃত চিরায়ত সংগীত-গ্রন্থ থেকে প্রাচীন ও অপ্রচলিত সুর তথা রাগ-রাগিনীর বাঙালায় রূপদান করেন; সে সম্পর্কেও গভীর গবেষণার অবকাশ আছে।

৭. ইংরেজী ভাষা থেকে অনুবাদ

ইংরেজী ভাষা থেকে কবি অনুবাদ ক'রেছেন—কবিতা, গান ও সংবাদ-নিবন্ধ। এ-বিষয়ে, আমেরিকান কবি হুইটম্যানের কবিতা, ইংরেজী ভাষায় রচিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের গান ও 'ইংলিশ ম্যাগাজিন' থেকে কয়েকটি সংবাদ-নিবন্ধই—এ-পর্যন্ত জ্ঞাত, কবির অনুবাদ-কর্মের পরিধি। ইংরেজী ভাষার ছন্দ ও ইউরোপীয় সুরে রচিত গানও নজরুল-রচনায় বর্তমান।

৮. বাঙালা ভাষা থেকে অনুবাদ

কবি নজরুল ইসলাম বাঙালা ভাষা থেকে নিজের যে-সব রচনা উরদু, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় তরজমা ক'রেছেন; সেগুলোর কথাও এ-প্রসঙ্গে উত্থাপন করা আবশ্যক। অথচ কবির অনুবাদ-কর্মের পরিচয়

www.pathagar.com

দিতে কেউ এ-বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেননি। কবি নজরুল ইসলাম বাঙালা ও হিন্দী ব্যতীত; উরদু এবং ইংরেজী ভাষায়—কবিতা, গান, নাটক ও চিত্রনাট্য রচনা ক'রলেও, নিজের কিছু কিছু গান এবং কবিতা—হিন্দী, উরদু ও ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রেছেন—আর এভাবে তিনি তাঁর অনুবাদ-রচনার পরিধি বিস্তৃতিদান ক'রেছেন—সন্দেহ নেই।

সংস্কৃত ছন্দ, আরবী ছন্দ, গজলের সুর ও আরবী, ফারছী, উরদু-হিন্দীর ভাব-ভাষা, বাগ্-ভঙ্গি, রাগ-রাগিনী, তাল ইত্যাদি—কবি, বাঙালায় এনেছেন, তরজমা-সূত্রেই।

একজন সৃজনশীল মৌলিক কবির বিভিন্ন ভাষায় বিচিত্রমুখী অনুবাদ-রচনা থাকার নমুনা —নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভার-ই অম্লান স্বাক্ষর।

এবার **কবির অনুবাদ-রচনার পরিচয় ও তার তুলনামূলক আলোচনা** পেশ করা হবে।

১. আরবী অনুবাদ

এক্ষেত্রে, কবি, যে-একখানিমাত্র রচনা—বাঙালায় অনুবাদ করেন, তাঁর নাম আগেই বলা হ'য়েছে—'কাব্যে আমপারা'। এটি পবিত্র 'কোরআন' শরীফের অংশ বিশেষ। একাধিক ব্যক্তি মূল আরবী থেকে 'আমপারা' কাব্যে অনুবাদ ক'রেছেন। মূল-গ্রন্থাংশ 'গদ্যে' রচিত। কিন্তু কবি নজরুল ইসলাম এ-গদ্য রচনাকে কাব্যে রূপদানের দুরূহ প্রয়াস চালিয়েছেন। তাতে তিনি কি রকম সাফল্য লাভ ক'রেছেন—তা আলোচ্য গ্রন্থের প্রকাশনা-ইতিহাস থেকে জানা যায়।

নজরুল-সুহৃদ্ মরহুম মাহফুজুর রহমান খান-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়—১৩৩৯ সালের চৈত্র মাসের শেষ দিকে কবি নজরুল ইসলাম অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়েন। তখন তাঁর কিস্তিতে কেনা, মোটর গাড়ীর

www.pathagar.com

কিস্তির টাকা বাকি পড়ে। এ-সংকট থেকে মুক্তি লাভের জন্য তিনি মাহফুজুর রহমান খানকে তাঁর 'কাব্য আমপারা'র পাণ্ডুলিপি প্রকাশের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানান। জনাব খান এ-ব্যাপারে করিম বক্স ব্রাদার্স নামক একটি প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের আরবী, ফারছী ও উরদু বিভাগের পরিচালক হেলাল উদ্দীন খান, প্রতিষ্ঠানটির মালিক, মওলানা আবদুর রহমান খান-এর সঙ্গে পরামর্শক্রমে শর্তসাপেক্ষে, পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের জন্য সম্মত হন। সে শর্ত হ'ল—'কবির অনুবাদ সঠিক হ'য়েছে কি না, তা আরবী-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা যাচাই ক'রে নিতে হবে। তাঁরা যদি সমর্থন করেন, তবেই বইটি প্রকাশ করা যাবে। এ-প্রস্তাব যদিও অসম্মানজনক এবং কবির গোচরে আনাও ছিল কঠিন; তথাপি গত্যন্তর না থাকায়, শর্তের কথা কবিকে জানানো হয়। কবি এতে খুব-ই ক্ষুণ্ন হন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সেভাব সামলে নিয়ে তিনি বলেন—"আমার কাব্য নিজের মেরুদণ্ডের উপর ভর ক'রে দাঁড়াতে পারবে কি না—এঁদের পাল্লায় প'ড়লে—তাই ভাবছি। কি আর ক'রব? আমার টাকার প্রয়োজন। রাজী হ'য়ে যাও।" এই ব'লে তিনি মাহফুজুর রহমানের নিকট সম্মতি জ্ঞাপন ক'রলে, তিনি হেলাল উদ্দীন খান ও মওলানা আবদুর রহমান খানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

তারপর এক রবিবারে, পাণ্ডুলিপি যাচাইয়ের অধিবেশন-অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। সেদিন যথাসময়ে, কবি নজরুল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান খান বৈঠকে উপস্থিত হন। তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসানো হয়। খান সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী—"ঘরে অনেক লোক।.....হল্-কক্ষে ওলামায়ে কেরাম, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ জানা-অজানা বহু লোকের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিল। মাওলানা আবদুর রশীদ, আবদুল মজিদ ও হেলাল সাহেব ব্যতীত আর যাঁহাদের নাম আমার মনে আছে, তাঁহারা হইলেন রেজাউর রহমান খান, এস্কান্দর গজনভী, আলীয়া মাদ্রাসার আরবী ভাষার প্রধান মোদাররেস মাওলানা মোমতাজ উদ্দীন ফখরুল

www.pathagar.com

মোহাদ্দেসীন, কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক, আলীয়া মাদ্রাসার কয়েকজন মোদাররেস্—আরও অনেকে। প্রকাণ্ড কক্ষে, পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা-লম্বি টেবিল সজ্জিত। টেবিলের দুই দিকে চেয়ার। প্রত্যেক চেয়ারের বরাবর টেবিলের উপর এক খানা কারিয়া বিভিন্ন ভাষার আমপারা বা কোরানের অনুবাদ সুরক্ষিত।.....

আরবী, উরদু, ইংরাজী ও বাংলা ভাষায়—কোরান শরীফের বহু দুষ্প্রাপ্য তরজমার একত্র সমাবেশ। যথা,—তফ্সীরে জালালাইন, তফ্সীরে কাশ্শাফী, তফ্সীরে বয়জাবী, তফ্সীরে কবিরী, তফ্সীরে হাক্কানী, তফ্সীরে হোসাইনী, তফ্সীরে আশ্রাফী। ইংরেজী অনুবাদের মধ্যে মাওলানা মোহাম্মদ আলী, আল্লামা ইউসুফ আলী, মার্মাডিউক পিকথল, পামার, আর্ভিং ও সেল্ প্রভৃতির কোরান। বাংলা ভাষায় মাওলানা আকরম খানের আমপারা, ভাই গিরিশচন্দ্রের আমপারা, জনাব আব্বাস আলীর আমপারা ও জনাব আ·দুল করিম সাহেবের আমপারা। কবির আমপারার বঙ্গানুবাদ নিয়া আলোচনার প্রারম্ভেই ভূমিকা স্বরূপ"—কবি স্বয়ং একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।
তারপর শুরু হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

মাহফুজুর রহমান খান লিখেছেন—"বিস্মিল্লাহির রাহ্মানের রাহিম" ও "সুরা ফাতেহা"র বঙ্গানুবাদ পাঠ করার পর—আরবী, উরদু ও ইংরাজী অনুবাদকেরা ঐ সুরারকে কি অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকটি কেতাবের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া, আলোচনা অন্তে, সামান্য দুই-একটি শব্দ রদবদল করা হইল। অনুবাদে তেমন কিছু পরিবর্তন হইল না। এক সুরা ফাতেহায়-ই সময় কাটিয়া গেল অনেকটা। সেই দিনের জন্য এই অনুবাদ-আলোচনা-প্রসঙ্গ স্থগিত রহিল। কথা হইল, পরবর্তী দিন হইতে বেলা পাঁচটায় অধিবেশন বসিবে।".....

পরদিনও এক-ই ভাবে—"প্রত্যেক সুরার বিভিন্ন অনুবাদকের অনুবাদের সহিত যাচাই করিয়া 'কাব্য আমপারা'র পাণ্ডুলিপি সংশোধন

www.pathagar.com

করা হয়।' বার দিন পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি–সংশোধনীর বৈঠকের পর—....."কাজ সমাপ্ত ছয়। লোকসংখ্যা যেন এই কয়দিন, প্রথম দিনের চেয়ে অধিক ছিল।

বার দিনের জলসায়,—মাওলানা আবদুর রশীদ সাহেব-ই ছিলেন প্রথম সমালোচক—বিভিন্ন তরজমার। আরবী, ফারছী ও উরদু সাহিত্যে তিনি যে কত বড় মহাপণ্ডিত, তাহা পূর্বে জানা ছিল না।.....

কত প্রকার সাহিত্য ও কাব্য আলোচনা, কোরানের বিভিন্ন সুরার কত প্রকার ব্যাখ্যা, প্রত্যেক সুরার শানে নজুলের ঐতিহাসিক আলোচনা.....ইত্যাদি সেই বার দিনের বারটি বিকাল বেলাকে আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল।"[১]

এরূপ অতি কঠোর পরীক্ষায়ও, যে-অনুবাদ উত্তীর্ণ হ'তে সমর্থ হ'য়েছে, **সে-অনুবাদ এবং তার অনুবাদককে** নিশ্চয় **তুচ্ছ করার কোন সুযোগ নেই।**

এবার দেখা যাক, **কবির অনুবাদ কি রকম** হ'য়েছে।

এ-তরফে প্রথমেই উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কবি নজরুল পবিত্র কোরান শরীফের ৩৮টি ছুরা অনুবাদ ক'রেছেন। এই ৩৮টি ছুরার প্রত্যেকটির শিরোভাগে অবস্থিত 'বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম'কে তিনি এত বিচিত্র ভাবে দু'পংক্তিতে অনুবাদ ক'রেছেন যে, তা বিস্ময়কর। যথা—

১. "(শুরু করিলাম) ল'য়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।"
২. "শুরু করিলাম পূত নামেতে আল্লার,
শেষ নাই, সীমা নাই, যাঁর করুণার।"
৩. "শুরু করিলাম নামে সেই আল্লার
করুণা-নিধান যিনি কৃপার পাথার।"

www.pathagar.com

৪. "শুরু করিলাম শুভ নামে আল্লার,
নাই আদি অন্ত যাঁর করুণা কৃপার।"
৫. "আরম্ভ করি ল'য়ে নাম আল্লার
আকর যে সব দয়া কৃপা-করুণার।"
৬."শুরু করিলাম পূত নামেতে খোদার।
কৃপা করুণার যিনি অসীম পাথার।" ইত্যাদি।

এছাড়া, কবি এক-একটি ছুরার পূর্ণ **অনুবাদে কিরূপ সফলতা অর্জন** ক'রেছেন—তা' নিম্নোক্ত তুলনা থেকে উপলব্ধি করা যায়। যথা,—

১.'ছুরা ফাতেহা'র **কিরণগোপালকৃত অনুবাদ**—

"যা কিছু প্রশংসা আছে—যা কিছু গৌরব,
সবি বিশ্ববিধাতার নিখিল প্রভব।
দানে যিনি কল্পতরু, করুণার নিধি,
কর্ম-ফল-দান-দিনে একমাত্র বিধি।
তোমাকেই মাত্র মোরা করি আরাধনা,
তোমার নিকটে করি সাহায্য প্রার্থনা।
আমাদের সেই পথ কর প্রদর্শন,
সুদৃঢ় সরল যাহা, অভিশপ্ত ভ্রষ্টগণ
যে পথে চলে না কভু, করুণা তোমার
ক'রেছ বর্ষিত যাহে করুণা আধার।"

২. এ-ছুরার **কবি গোলাম মোস্তফাকৃত অনুবাদ** নিম্নরূপ—

"সকল তারীফ সেই আল্লাহ্-তালার
নিখিলের রব যিনি পরোয়ার দিগার।
যিনি চির-প্রেমময় চির-মেহেরবান
বিচার দিনের যিনি মালিক মহান।
তোমারেই শুধু মোরা করি ইবাদৎ
তোমারি কাছেতে চাই শকতি-মদদ।

www.pathagar.com

দেখাও সরল পথ–থাদের সে পথ
যাদের উপরে ঝরে তব নিয়ামৎ।
নয় তাহাদের পথ—অভিশপ্ত যারা
কিংবা যারা পথ পেয়ে হ'ল পথ হারা।"

৩. এ-ছুরার কবি নজরুল ইসলামকৃত অনুবাদ নিম্নরূপ—

"সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের বিভু! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তিভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও
যাদেরে বিলাও দয়া সে-পথ দেখাও।
অভিশপ্ত আর পথ ভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়োনা কভু!"

লক্ষণীয় যে, কিরণ গোপাল ও গোলাম মোস্তফা যে-ছুরা দশ পংক্তিতে অনুবাদ ক'রেছেন, নজরুল তার অনুবাদ ক'রেছেন মাত্র আট পংক্তিতে। ড. সুশীল কুমার গুপ্ত লিখেছেন—"এই সুরাটির অনুবাদে নজরুল অসামান্য সফলতা অর্জন ক'রেছেন। সঠিক অনুবাদ হ'য়েও এটিতে কোন আড়ষ্টতা নেই।" তিনি কবিকৃত "ছুরা ইখলাস'-এর অনুবাদটিও সরল ও সুন্দর" ব'লে মন্তব্য ক'রেছেন। আর 'ছুরা কারেয়াত'-এর অনুবাদ সম্পর্কে ব'লেছেন—" এ-অনুবাদে মাত্রাবৃত্তের চালে নজরুল কাব্যের গতি শীলতাকে স্পর্শ করা যায়।"[২]

২. ফারছী অনুবাদ

পূর্বেই বলা হ'য়েছে—কবি নজরুল ইসলাম ফারছী রুবাই, গজল ও কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করেন। তিনি কবি হাফিজ-এর 'দিউয়ান-ই হাফিজ', কবি ওমর খৈয়াম-এর 'রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম', কবি

www.pathagar.com

রুমির একটি কবিতা এবং হাফিজের কিছু গজল-এর বাঙালা-তরজমা করেন।

কবির ফারছী-অনুবাদের দিকে তাকালে দেখা যায়, তিনি হাফিজ-এর রচনাতেই বেশী আকৃষ্ট হন এবং সমস্ত ইরানী কবির মধ্যে কবি হাফিজ-এর প্রভাব-ই নজরুল-রচনায় অধিক। নজরুল সর্বপ্রথম যে-গজলটি অনুবাদ ক'রে করাচী থেকে পাঠান এবং ১৩২৬ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়; 'আশায়' নামক সেই ছোট্ট রচনাটিও ছিল—কবি হাফিজের-রচনার-ই ভাষান্তর।

উল্লেখযোগ্য যে, নজরুলের 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ সালের আষাঢ় মাসে। মোট ৭৩ টি রুবাইয়ের অনুবাদ এতে বিদ্যমান। কিন্তু আসলে তিনি অনুবাদ ক'রেছেন—মোট ৭৫টি রুবাই। বাকি দু'টা পাওয়া যায়–ভূমিকার মধ্যে কবি সে দু';টিকে প্রক্ষিপ্ত ব'লে ভেবেছেন।

এ-বিষয়ে তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—"সত্যকার হাফিজকে চিনতে হ'লে তাঁর গজল-গান প্রায় পঞ্চশতাধিক প'ড়তে হয়। তাঁর রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতাগুলি প'ড়ে মনে হয়, এ-যেন তাঁর অবসর সময় কাটানোর জন্যই লেখা।.....হয়তা ছোট ব'লেই এত সুন্দর!

আমি অরিজিন্যাল (মূল) ফারছী হ'তেই এর অনুবাদ ক'রেছি। আমার কাছে যে কয়টি ফারছী 'দিউয়ান-ই হাফিজ' আছে, তার প্রায় সব কয়টাতেই পঁচাত্তরটি রুবাইয়াৎ দেখতে পাই। অথচ ফারছী সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত সমালোচক ব্রাউন সাহেব তাঁর History of Persian Literature-এ এবং মৌলানা শিবলী নোমানী তাঁর 'শেয়রুল আজম'-এ মাত্র ঊনসত্তরটি রুবাইয়াতের উল্লেখ ক'রেছেন; এবং এই দু'জন-ই ফারছী কবি ও কাব্য সম্বন্ধে Authority—বিশেষজ্ঞ। আমার নিজেরও মনে হয়, ওঁদের ধারণাই ঠিক। আমি হাফিজের মাত্র দু'টি রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি—যদিও আরও তিন চারটি বাদ দেওয়া

www.pathagar.com

উচিত ছিল।.....**সমস্ত রুবাইয়াতের আসল সুরের সঙ্গে** অন্ততঃ এদু'টি রুবাইয়াতের সুরের কোন মিল নেই।"[৩]

এ-উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কী ব্যপক ও গভীরভাবেই না কবি ফারছী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং তার রস-অহরণে সমর্থ হন।

এবার, হাফিজের কাব্যানুবাদে তাঁর দক্ষতা-বিচার করা যেতে পারে।

ড. সুশীল কুমার গুপ্ত লিখেছেন—"বাঙ্‌লা ভাষায় হাফিজের কবিতার অনুবাদক হিসাবে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, অজয় কুমার ভট্টাচার্য ও নজরুল ইসলামের নাম-ই বিশেষভাবে স্মরণীয়।"[৪] অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী আকরম হোসেন প্রমুখও হাফিজ-এর রচনার অনুবাদ ক'রেছেন।

এ-সব অনুবাদকের মধ্যে কবি কাজী নজরুল ইসলামের **অনুবাদ-সাফল্য** কি রকম—এবার তা দেখা যেতে পারে। যথা—

১. মোহিতলাল মজুমদার ইরানী কবি হাফিজের নিম্নোক্ত বয়াতের অনুবাদ ক'রেছেন—

"আগার আঁতুর্কে সিরাজী বদশ্‌ত আরদ্ দিলে মারা
বখালে হিন্দুয়স্ বখ্‌শম্ সমরকন্দ অ বোখারারা ॥"

উক্ত কবিতার মোহিতলাল মজুমদার যে-তরজমা ক'রেছেন, তা হ'ল—

"শীরাজের সেই তুরাণী রূপসী বে-দরদী,
যদি কোনদিন দরদ বোঝে এ
সুখ-হারার
লাল সে গালের—কালো তিলটির
বদলে গো,
দিয়ে দিতে পারি সমরকন্দ

www.pathagar.com

বোখারা আর।"

এ-কবিতাংশের নজরুল ইসলামকৃত অনুবাদ—

"যদি-ই কান্তা সিরাজ-সজনী
ফেরৎ দেয় মোর চোরাই দিল্ ফের
সমরকন্দ আর বোখারায় দি
বদল তার লাল গালের তিল্‌টের।"

২. হাফিজের অপর একটি কবিতার অনুবাদ ক'রেছেন, **শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন**। হাফিজের 'বয়াত' এরূপ—

"মোতারেবে খোশ্ নওয়া
বোগো তাজা-ব-তাজা
নও-ব-নও"।

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্নকৃত উক্ত কবিতাংশের তরজমা নিম্নরূপ—

"গাওহে গায়ক গাও হে মধুর
নূতন নূতন ধরনে
তুলিয়া ললিত সুমধুর, সুর
নূতন নূতন ধরনে।"

কবি হাফিজের কবিতার উক্ত অনুবাদের সঙ্গে নজরুলকৃত নিম্নোক্ত অনুবাদ তুলনীয়—

"আরো নূতন নূতনতর
শোনাও গীতি গানেওয়ালা।
আরো তাজা শারাব ঢালো,
করো করো হৃদয় আলা॥"

এরকম আরও তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে দেখানো যেতে পারে—কবি, হাফিজের কবিতার যে- অনুবাদ ক'রেছেন—তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে। এ-সব অনুবাদের কোন

www.pathagar.com

কোনটি এত মধুর, সুন্দর, নিটোল ও রসময় যে, সেগুলো মৌলিক রচনা ব'লেই মনে হয়। নজীর হিসেবে কবির অনুদিত "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ"-এর ৮, ১৫, ৪৯, ৬১, ৬২, প্রভৃতি সংখ্যক অনুবাদ-রচনার উল্লেখ করা যায়।

অতঃপর কবি নজরুল ইসলামের অপর অনুবাদ-কাব্য **'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম'**-এর আলোচনা করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, কবি হাফিজের রচনার ন্যায় কবি ওমর খৈয়ামের রচনার সঙ্গে বাঙালী পাঠকান নজরুল ইসলামের অবির্ভাবের আগেই পরিচিত হন। বাঙালা সাহিত্যে নজরুল ব্যতীত অন্য যে-সব কবি ওমর খৈয়াম-অনুবাদ করেন; তাঁদের মধ্যে অক্ষয় কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, হিতেন্দ্র মোহন বসু, নরেন্দ্র দেব, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সিকান্দর আবু জাফর, মীজানুর রহমান, শফিকুর রহমান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁরা অধিকাংশই মূল ফারছী থেকে ওমরের রুবাই অনুবাদ ক'রেছেন। নজরুল ইসলামের অনুবাদও মূল ফারছী থেকে।

তিনি "রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়ামে"র ভূমিকায় লিখেছেন—"আমি ওমরের রুবাইয়াৎ ব'লে প্রচলিত প্রায় **এক হাজার রুবাই থেকেই কিঞ্চিদধিক দু'শ' রুবাই বেছে নিয়েছি;** এবং **তা ফারছী ভাষার রুবাইয়াৎ থেকে**। কারণ আমার বিবেচনায় এইগুলি ছাড়া বাকী রুবাই **ওমরের** প্রকাশ-ভঙ্গি বা **স্টাইলের সঙ্গে** একেবারে মিশ খায় না।.....আর তা যদি ওমরের-ই হয়, তবে তা অনুবাদ ক'রে পণ্ডশ্রম করার দরকার নেই। **বাগানের গোলাপ তুলব; তাই ব'লে বাগানের আগাছাও তুলে আনতে** হবে, এর কোনো মানে নেই।

আমি আমার ওস্তাদী দেখাবার জন্য ওমর খৈয়ামের **ভাব-ভাষা বা স্টাইলকে** বিকৃত করিনি—অবশ্য আমার সাধ্যমত। এর জন্য **আমাকে অজস্র পরিশ্রম ক'রতে হ'য়েছে**। বেগ পেতে হ'য়েছে।

www.pathagar.com

কাগজ পেন্সিলের, যাকে বলে **আদ্য-শ্রাদ্ধ,** তা-ই **ক'রে ছেড়েছি**।"[৫]

এ-বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, কবির ফারছী সাহিত্য-অধ্যয়নের ব্যাপক ও গভীরতা সম্পর্কে। তিনি ফারছী সাহিত্যের বিশেষতঃ হাফিজ ও ওমরের কবিতার কী রকম জহুরী ছিলেন, তা তাঁর—এক হাজার কবিতার মধ্য হ'তে "কিঞ্চিদধিক মাত্র দু'শ রুবাই" বেছে বের করা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। ওমরের রচনা-অনুবাদে কবি নজরুল ইসলামের শ্রম ও নিষ্ঠার কথাও উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে জানা যায়। আর জানা যায়—ইরানী, বিশেষ বিশেষ কবির রচনার বিশেষত্বজ্ঞাপক "ভাব-ভাষা-স্টাইল" ও "আসল সুর সম্পর্কে কেমন নিশ্চিত ধারণা ছিল তাঁর।

কবি নজরুল—বিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদক ফিট্‌জেরাল্ডের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে ব'লেছেন—"ওমর খৈয়ামের ভাবে অনুপ্রাণিত ফিট্‌জেরাল্ডের কবিতার যাঁরা অনুবাদ ক'রেছেন, তাঁরা সকলেই আমার চেয়ে শক্তিশালী ও বড় কবি। কাজেই তাঁদের মত মিষ্টি শোনাবে না হয়তো আমার এ-অনুবাদ।"[৬] কিন্তু **মিষ্টত্বই ওমর খৈয়ামের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়।**

তাই ওমরের কবিতার বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কবি নজরুল ইসলাম লিখেছেন—"ওমরের রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতা, চতুষ্পদী হ'লেও তার চারটি পদ-ই ছুটেছে আরবী ঘোড়ার মতো দৃপ্ত তেজে সমতালে—ভণ্ডামি, মিথ্যা বিশ্বাস, সংস্কার, বিধি-নিষেধের পথে ধূলি উড়িয়ে, তাদের বুক চূর্ণ ক'রে। সেই উচ্চৈঃশ্রবা আমার হাতে প'ড়ে হয়তবা বজদ্দি মোড়লের ঘোড়াই হ'য়ে উঠেছে।.....ওমরের বোররাক বা উচ্চৈঃশ্রবাকে আমার মতো আনাড়ি সওয়ার যে বাগ মানাতে পারবে, সে ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে উক্ত বজদ্দি মোড়লের মতো সে ঘোড়াকে তার উচ্ছামত পথেও যেতে দিইনি। লাগাম ক'ষে প্রাণপণ বাধা দিয়েছি, যাতে সে অন্য পথে না যায়।.....এটুকু জোর ক'রে বলতে

www.pathagar.com

পারি, তাঁর ঘোড়া আমার হাতে পড়ে চতুষ্পদী ভেড়াও হ'য়ে যায়নি—প্রাণহীন **চার পায়াও** হয়নি। আমি ন্যাজ ম'লে ম'লে ওর অন্ততঃ **তেজটুকু নষ্ট করিনি**।"[৭]

এই **তেজ বা গতি-ই হ'চ্ছে ওমর খৈযামের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য**। কবি সে-বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস পেয়েছেন।

কবি-সমালোচক মরহুম আবদুল কাদির ব'লেছেন—"১৩৪০ কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষের মাসিক 'মোহাম্মদী'তে নজরুলের অনুদিত ওমর খৈয়ামের ৫৯টি রুবাই ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'য়েছে—তাঁর প্রায় ২৬ বছর পরে—১৩৬৬ র পৌষে। তাতে স্থান লাভ ক'রেছে ১৯৭ টি রুবাই।"[৮]।

পূর্বেই উল্লেখ করা হ'য়েছে—"নজরুল নিজে ব'লেছেন, তিনি ওমর খৈয়ামের দু'শতাধিক রুবাই বেছে নিয়েছেন। কিন্তু গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে ১৯৭টি। বাকিগুলোর হদিস এখনও পাওয়া যায়নি।

যাহোক, এবার অন্যান্যের অনুবাদের সঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদ মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। বিচার করা যেতে পারে—নজরুল-কৃত অনুবাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, খৈয়ামের "গর্ দস্ত্ দিহাদ যি মঘ্য-ই গনদুম নানী" রুবাইটির—

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকৃত অনুবাদ—

"বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি
পাই যদি এক পাত্র মদিরা আর যদি তুমি রাণী
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া গাহ গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ আমার তৃপ্তি লভিবে প্রাণ।"

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অনুবাদ—

"চুমুক খানিক লাল মদিরা আর গজলের একটি কিতাব,

www.pathagar.com

জান বাঁচাতে দরকার মতো একটুখানি রুটি কাবাব।
তোমায় আমায় দু'জনেতে বসে প্রিয়ে নির্জনেতে,
এসুখ ছেড়ে রাজ্য পেলেও কিছুতেই সে ব'লব না লাভ।"

কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ—

"সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়;
মৌন ভাঙি মোর পাশেতে
গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর—
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার,
সেই বনানী স্বর্গপুর।"

আর কবি নজরুল ইসলামের অনুবাদ—

"এক সোরাহি সুরা দিও, একটু রুটির ছিল্‌কে আর,
প্রিয় সাকী, তাহার সাথে একখানি বই কবিতার।
জীর্ণ আমার জীবন জুড়ে রইবে প্রিয়া আমার সাথ
এই যদি পাই চাইব না কো তখ্‌ত আমি শাহানশার"।

এ-চারটি অনুবাদের মধ্যে প্রথম দু'টি অনুবাদের যে গতিহীনতা বা আড়ষ্টতা আছে—তা নজরুলকৃত অনুবাদে নেই। কান্তিচন্দ্র ঘোষকৃত তৃতীয় অনুবাদ আড়ষ্টহীন বটে; কিন্তু মূলের সঙ্গে সর্বত্র সঙ্গতি নেই। নজীর হিসেবে বলা যায়— সব অনুবাদক-ই লিখেছেন, 'কবিতার বই' সঙ্গে থাকার কথা; কিন্তু কান্তিচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন—'কবিতা রচনা'র কথা। অনুবাদে এতখানি স্বাধীনতা কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। অধিকন্তু কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ তরল, তা সাধারণ পাঠকের জন্য উপযোগী; কিন্তু নজরুলের অনুবাদ তরল নয়; তার মধ্যে গাম্ভীর্য ও লালিত্য উভয়-ই বিদ্যমান। এজন্য তা সকল শ্রেণীর পাঠকের-ই উপযোগী। এই

www.pathagar.com

গাম্ভীর্যপূর্ণ তরজমাকেই কবি 'বজদ্দি মোড়লের লাগাম পরানো ঘোড়া' ব'লে ইশারা ক'রেছেন।

এ-রকম আরও নজীর হাজির ক'রে দেখানো যায়, কবি নজরুল ইসলামের 'রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়ামে'র অনুবাদ যথেষ্ট মূলানুগ এবং উৎকৃষ্ট।

৩. পশ্‌তু-অনুবাদ

পূর্বেই বলা হ'য়েছে—'বাঙ্গালী রেজিমেন্টে' কর্মরত অবস্থায় কবি পাখতুনী-পাঞ্জাবী সৈনিকদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের সঙ্গে সহজ ভাব-বিনিময়ের জন্যই তিনি পশ্‌তু শেখেন। সম্ভতঃ এ-ব্যাপারে যে-বাঙ্গালী পল্টনের মৌলানা সাহেব তাঁকে ফারছী শিখতে উদ্বুদ্ধ করেন—তিনি-ই হয়তো তাঁকে পশ্‌তু শিখতেও সহায়তা ক'রেছেন। ১৯২০ সালে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় **'বিরহ-বিধুবা** নামক, কবির একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। মরহুম আবদুল কাদির জানিয়েছেন—"কবিতাটির নীচে পাদটীকায় লেখা আছে পুশ্‌তো ভাষার খ্যাত-নামা কবি খুশ্‌হাল খান খটকের হিন্দুস্তানে নির্বাসনকালে তাঁর সহধর্মিনীর লিখিত একটি কবিতার ভাব অবলম্বনে" রচিত।[৯]

এছাড়া, কবি আর কোন পশ্‌তু কবির কবিতা অনুবাদ ক'রেছেন কি না—তা আজও জানা যায়নি।

নজরুল ইসলাম ব্যতীত; বৃটিশ আমলে—অন্য কোন কবি পশ্‌তু ভাষা থেকে অনুবাদ ক'রেছেন ব'লেও জানা নেই।

৪. উরদু অনুবাদ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ভালভাবে উরদু ভাষাও আয়ত্ত করেন। তাঁর উরদু সাহিত্যের সঙ্গে কি রকম অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, তা—মোহাম্মদ সুলতান-অনুদিত 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া'র সমালোচনা থেকে জানা যায়। কবি উক্ত সমালোচনায় লিখেছেন—"সুলতানের 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া'র কাব্যানুবাদ প'ড়লাম,

www.pathagar.com

আসল "শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া" পাশে রেখে। অনুবাদের দিক দিয়ে এমন সার্থক অনুবাদ আর দেখেছি বলে মনে হয় না। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইকবালের অপূর্ব সৃষ্টি এই "শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া"। উরদু ভাষী ভারতবাসীর মুখেমুখে আজ 'শেকওয়া'র বাণী। সেই বাণীকে রূপান্তর করা **অত্যন্ত দুরূহ মনে করেই আমিও ওতে হাত দিতে সাহস করিনি**। কবি সুলতানের অনুবাদ প'ড়ে বিস্মিত হ'লাম, **অরিজিন্যাল ভাবকে** এতটুকু অতিক্রম না ক'রে এর অপরিমাণ সাবলীল সহজ গতি-ভঙ্গী দেখে **সি কপি**। পশ্চিমের বোরকা-পরা মেয়েকে বাঙলার শাড়ির অবগুণ্ঠনে যেন আরো বেশী মানিয়েছে।"[১০]

উল্লেখ্য, কবি নজরুল "শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া"-র অনুবাদে হাত না দিলেও, অন্য কোন উরদু রচনার অনুবাদ ক'রেছেন কি না, তা এ-ভূমিকা থেকে জানা যায় না। ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, কবি আবদুল কাদির অথবা অন্য কেউ, তাঁর—উরদু থেকে অনুদিত কোন রচনার উল্লেখ করেননি।

তবে, কেউ কেউ উরদু কবি হালীর রচনার ভাবানুবাদ নজরুল ইসলামের কোন কোন কবিতায় লক্ষ্য ক'রেছেন। অধিকন্তু নজরুল ইসলামের 'সুর ও শ্রুতি' নামক রচনাটি কারো কারো মতে রাজা নওয়াব আলী চৌধুরীর উরদু "মারিফুন্নাগমাত"-এর "স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।" এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা, নজরুল ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত 'দশক ব্যাপী নজরুল জন্মশতবার্ষিকী বক্তৃতামালার দ্বাদশ বক্তৃতা'য় আমি উপস্থাপন করেছি।[১১]

৫. হিন্দী অনুবাদ

এক-ই ভাবে, নজরুল ইসলামের হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যেও ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। ভারতীয় বাঙালার অন্যতম নজরুল-বিশেষজ্ঞ মরহুম আবদুল আজিজ আল্ আমান লিখেছেন—"সংস্কৃত বর্ণমিছিলের সঙ্গে

www.pathagar.com

কিছু পরিচয় থাকলেও হিন্দীর সঙ্গে ছাত্র-জীবনে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না, পরবর্তীকালে কবি ধীরে ধীরে এভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হন। শেষে এমন পারদর্শিতা অর্জন করেন যে, **স্বরচিত সঙ্গীতগুলির সাবলীল হিন্দি রূপান্তর মৌলিক সৃষ্টির মতই তাঁর কাছে অনায়াস হ'য়ে ওঠে**। এমন কি এ-ভাষাতে তিনি কিছু সংখ্যক মৌলিক সংগীত এবং ন্যূনপক্ষে একটি রেকর্ডনাটিকা রচনা করেন। তাঁর এই হিন্দী জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পর্কে ব'লতে গিয়ে একজন প্রখ্যাত সুরকার অত্যন্ত বেদনাতুর কণ্ঠে আমাকে বলেন; বোম্বাই চিত্রজগতে আজ বাঙালি সুরকারদের যে দাপট এবং কদর (শচীন দেব বর্মন তখন জীবিত), নজরুল সক্রিয় থাকলে তাঁর সাম্রাজ্য এবং অধিপত্যে এঁরা নিষ্প্রভ হ'য়ে থাকতেন এবং যে অর্থের টানা-টানিতে সারাজীবন পীড়িত হ'য়েছেন তিনি—তা হয় তো, দূর হ'য়ে যেত চিরদিনের জন্য।"[১২]

অতঃপর জনাব আল্ আমান নজরুল-রচিত, নবাবিষ্কৃত ২৬টি হিন্দী গান সম্পর্কে লিখেছেন—এগুলোর "আধিকাংশ গান-ই মৌলিক।" তিনি কবি নজরুল ইসলামের রচিত পাঁচটি গানের হিন্দী রূপান্তরের উল্লেখ ক'রেছেন। সেগুলো হ'ল—

১. চঞ্চল সুন্দর নন্দকুমার।
২. বিকাল বেলার ভূঁই চাঁপা গো.....।
৩. নিশি না পোহাতে যেয়ো না যেয়ো না....॥
৪. আমার খোকার মাসী।
৫. ওহো আজকে হইব মোর বিয়া॥

এই পাঁচটি গানের মধ্যে "নিশি না পোহাতে" গানটির মূল বাঙালা রূপ ও তার হিন্দী রূপান্তর নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল। এ-থেকে কবির হিন্দী অনুবাদের ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করা যাবে।

বাঙালা

নিশি না পোহাতে যেয়োনা যেয়ো না

www.pathagar.com

দীপ নিভিতে দাও ॥
নিবু-নিবু প্রদীপ নিবুক হে পথিক
ক্ষণিক থাকিয়া যাও।
দীপ নিভিতে দাও ॥

আজও শুকায়নি মালার গোলাপ,
আশা-ময়ূরী মেলেনি কলাপ,
বাতাসে এখনও জড়ানো প্রলাপ
বারেক ফিরিয়া চাও।
দীপ নিভিতে দাও ॥

ঢুলিয়া পড়িতে দাও ঘুমে অলস আঁখি
ক্লান্ত করুণ কায়,
সুদূর নহবতে বাঁশরী বাজিতে দাও
উদাস যোগিয়ায়।।

হে প্রিয় প্রভাতে তব রাঙা পায়
বকুল ঝরিয়া মরিতে চায়,
তব হাসির আভায় তরুণ অরুণ প্রায়
দিক রাঙিয়ে যাও।
দীপ নিভিতে দাও ॥

কবির কলমে এ-গানের হিন্দী অনুবাদ যে-রূপ নিয়েছে, তা এই—

অভি নিশি রহি ন যাও ন যাও
দিয়া বুঝনে দো
বুঝতি হুয়ি দিয়া পিয়া বুঝনে দো
মুসাফির ঠাইরো
দিয়া বুঝ্নে দো॥
নিঁদ আলসী আঁখ রুদ্ধ হো নে দো
ক্লান্ত করুণ দেহ

www.pathagar.com

দূর নৌবৎ সে বাজনে দো বাঁশরী
উদাস যোগিয়া মেঁ ।

না প্যারে তেরে চরণোঁ পর
গুল মৌৎ চাহে গির্ কর্
তেরী হঁসী কো নবারুণিমা সে
দিশা রংগায়ে দো
দিয়া বুঝনে দো॥

অভি মিলায় ব্হা হাওয়া মে প্রলাপ
আশা শিখি অভি না কৈলা কলাপ
অভি তাজা রহা হাত মে গুলাব
জরা সা দেখকে যাও
দিয়া বুঝ্নে দো ॥

লক্ষণীয় যে, এই অনুবাদের শেষ স্তবক মূল রচনার দ্বিতীয় স্থানে ছিল। হয়তো স্মৃতি থেকে দ্রুত অনুবাদ ক'রতে গিয়ে এটি স্থানচ্যুত হয় এবং সেজন্য কবি স্তবকটি পরে অনুবাদ ক'রে রাখেন খাতায়। যেহেতু রচনাটি পাণ্ডুলিপিভুক্ত ছিল, সে-কারণে সম্ভবত:—'যেমন আছে—তেমন ভাবে' ছেপে দেয়া হ'য়েছে। এরূপ ঘটা স্বাভাবিক । প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য না ক'রে পারা যায়না যে, কবি এই শেষ অনুচ্ছেদের অনুবাদে হুবহু মূলানুসরণ করেননি। তিনি মূল রচনার এক-ই অনুচ্ছেদের তৃতীয় পংক্তিকে অনুবাদে প্রথম পংক্তিতে স্থান দিয়েছেন।[১৩] স্বীয় রচনার এই বিশেষ-অনুবাদ সজ্জা কি অনুবাদের নতুন কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত?

যাহোক, নিজের বাঙালা রচনা, হিন্দীতে অনুবাদ করা ব্যতীত কোন হিন্দী কবির রচনা বাঙালায় অনুবাদ ক'রেছেন কি না—তা আজও জানা যায়নি।

www.pathagar.com

৬. সংস্কৃত-অনুবাদ

কবি নজরুল ইসলাম উরদুর মতই সংস্কৃত থেকে কোন কবিতা বা গ্রন্থ অনুবাদ ক'রেছেন কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ আজ পর্যন্ত তেমন কোন নজীর পাওয়া যায়নি। তাঁর সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের সাথে সম্পর্ক কতটা গভীর ছিল, সে-বিষয়েও যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। এ-তরফে আলোচনাকালে, জনাব আবদুল মান্নান সৈয়দ "সংস্কৃত কবিতা/নজরুল" শিরোনামে যে-দীর্ঘ আলোচনা ক'রেছেন, তার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। জনাব মান্নান উক্ত রচনায় নজরুল ইসলামের ওপর সংস্কৃত সাহিত্য ও ছন্দ-শাস্ত্রের প্রভাব দেখিয়েছেন।[২৪] বর্তমান প্রসঙ্গে সে-আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তবে তাঁর আলোচনা থেকে, কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে, 'মেঘদূত'-'গীত গোবিন্দ' ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন তা বোঝা যায়। কবি সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষার সঙ্গে গভীর পরিচয় না রাখলে, সংস্কৃত ছন্দ বাঙালা কবিতায় আনার চেষ্টা ক'রতেন না। পারতেনও না।

নজরুল ইসলাম সংস্কৃত, তোটক, শার্দূলবিক্রীড়িত, অনঙ্গশেখর, চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত, রুচিরা, মঞ্জুভাষিণী ইত্যাদি ছন্দে সাবলীল ভাবে বাঙালা কবিতা রচনা ক'রেছেন।

কিন্তু কবির সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তার সংগীত-চর্চা ও সংগীত–বিষয়ক রচনা—'সুরও শ্রুতি'র মধ্যে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃতে রচিত—'সঙ্গীত-রত্নাকর', 'রাগ-বিবোধ', 'সংগীতকলানধি' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের নামোল্লেখ ক'রেছেন ও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এথেকে কবির সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় মেলে। তাঁর "যাও মেঘ দূত দিও প্রিয়ার হাতে" গানটি শুনলে মনে হয়, তিনি ঐ একটি গানের মধ্যে গোটা মেঘদূত কাব্যই 'অনুবাদ' ক'রে দিয়েছেন।

অতএব, কবি কাজী নজরুল ইসলাম সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সরাসরি কোন কাব্য-কবিতা অনুবাদ না ক'রলেও তাঁর কবিতার ভাষা, ছন্দ ও

www.pathagar.com

গানের সুর-তাল এবং আবহের ওপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব না-কবুল করা যায় না।

অন্যদিকে, তিনি নিজের কোন রচনা সংস্কৃতে অনুবাদ ক'রেছেন কি না—তা জানা না গেলেও, কবির "সিগ্ধ শ্যাম বেণীবর্ণা"এবং "কাপ কেট্‌লি নিবাসিনী সিদ্ধি বিধায়িনী মানস-তামস মোষিণী হে/দুগ্ধ ও শর্করা মিশ্র শ্বেতাম্বরা চীনা ট্রে বাহিনী জাড্য হরে" কৌতুক সঙ্গীতটি, জয়দেবের বাঙালা প্রতীম সংস্কৃত রচনার কথাই মনে করিয়ে দেয়। এরকম আরও কিছু গান আছে যা সংস্কৃত রচনার কাছাকাছি পৌছে গেছে—বলা যায়।

৭. ইংরেজী অনুবাদ

নজরুল ইসলাম ইংরেজী ভাষায়ও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন ক'রেছিলেন। তিনি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে কত ব্যাপক ভাবে পরিচিত ছিলেন, তা তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই হাফিজ' ও 'রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম'-এর অনুবাদ-গ্রন্থের লিখিত ভূমিকায় ধরা প'ড়েছে। তাছাড়া, "বর্তমান বিশ্বসাহিত্য" নামক প্রবন্ধ এবং ১৯৪১ সালে ইংরেজী ভাষায় লিখিত একটা কবিতাও, এর বিশিষ্ট প্রমাণ। কবির ইংরেজী সাহিত্য-চর্চার কথা স্বীকার ক'রেছেন—তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মরহুম কমরেড মুজফফ্‌র আহ্‌মদও।

নজরুল ইসলাম কোন ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ অনুবাদে উৎসাহিত হ'য়েছেন ব'লে জানা যায় না। তবে মার্কিন ও ইংরেজ কবিদের কারো কারো রচনার ভাবানুবাদ বা আক্ষরিক অনুবাদ ক'রেছেন—এ-কথা ঠিক। 'দুনিয়ার মজদুর'দের জন্য রচিত একটি আন্তর্জাতিক সংগীতকে, বাঙ্‌লায় রূপান্তরও কবির অপর সুউচ্চ কীর্তিস্তম্ভ। কারণ এরকম অনুবাদ আর কেউ ক'রতে পারেননি। সার্থক অনুবাদের নজীর হিসেবে এ-পর্যন্ত কবির ইংরেজী ভাষা থেকে অনুদিত ৭টি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলো হ'ল—

www.pathagar.com

১. আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংগীত (গান)।
(জাগো অনশন বন্দী ওঠ রে যত)
২. অগ্রপথিক—কবিতা। হুইটম্যান-এর "ও পাইওনীয়ারস্ ও পাইয়োনীয়ারস্" কবিতার অনুবাদ।
৩. জাগর-তূর্য। কবি জানিয়েছেন—এটি ইংরেজ কবি শেলির একটি কবিতার ভাব-অবলম্বন ক'রে লেখা। (প্রথম চরণ—"ওরে ও শ্রমিক সব মহিমার উত্তর-অধিকারী"।)
৪. রক্ত-পতাকার গান। এটাও একটি কবিতা। কবি জানিয়েছেন—এটি কোন একটি ইংরেজী গান শুনে রচিত। প্রথম চরণ—"ওড়াও ওড়াও লাল নিশান"।.....)।

এছাড়া,—তাঁর আরও নামক তিনটি রচনার উল্লেখ করা হ'য়ে থাকে।

৫. জননীদের প্রতি।
৬. পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব।
৮. জীব-বিজ্ঞান।

রচনা-তিনটি Englishman পত্রিকার Magazine Section থেকে কবি অনুবাদ করেন এবং 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'র বৈশাখ সংখ্যায় সেগুলো প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল ১৩২৭।[১৬]

কবির নিজের সম্পাদিত "ধূমকেতু"-পত্রিকায় প্রকাশিত "বেহায়া পুরুষের ইতরামি", "বিদ্রোহী ভারত" ও "সভ্যতার কল"প্রবন্ধ তিনটিও অনুবাদ। এগুলোর মধ্যে প্রথমটি "এডুকেশন গেজেট" থেকে অনুদিত এবং ঐ পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত। "বিদ্রোহী ভারত"Indiain Daily News থেকে অনুবাদ করা হয় এবং প্রকাশিত হয়—ধূমকেতু'র ১৬শ সংখ্যায়।[১৭] তৃতীয় প্রবন্ধটি 'সভ্যতার কল'। প্রকাশিত হয়—"ধূমকেতু'র ২৬শ সংখ্যায়।

অতএব, ইংরেজী ভাষা থেকে কবি অনুবাদ করেন—গান, কবিতা ও সংবাদ-নিবন্ধ।

www.pathagar.com

কবির ইংরেজী থেকে অনূদিত কবিতার শিল্পরূপ সম্পর্কে এ-পর্যন্ত বিশেষ কোন আলোচনা করা হয়নি। আলোচনা করা হয়নি, এরকম একটি অনুবাদ-রচনারও চারিত্র্য সম্পর্কে। এ-প্রসঙ্গে কেউ কেউ হয়তো সৈয়দ আলী আহসান, কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্র পথিক' কবিতার সঙ্গে আমেরিকান কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'পাইয়োনীয়ারস্, ও পাইয়োনীয়ারস্' কবিতার যে-তুলনা, ক'রেছেন, তার উল্লেখ ক'রতে পারেন।

সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন—"জিঞ্জীর গ্রন্থের অগ্রপথিক কবিতাটি সাধারণ্যে অত্যন্ত বেশী পরিচিত। অসাধারণ গতিবেগ, ছন্দের দ্রুত লয় ও সম্মিলিত কণ্ঠোপযোগী শব্দ-বিন্যাসের জন্য কবিতাটি আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। সংস্কার-বিমুক্ত মন, নবসৃষ্টির উন্মাদনায় চিরাচরিত নীতিকে অগ্রাহ্য ক'রেছে। চিরদিনের গৃহীত ব্যবস্থাকে অস্বীকার ক'রেছে এবং এক-ই সঙ্গে সৃষ্টির উদ্দাম ও বিকাশ দেখতে পেয়েছে। অথচ এত সুন্দর কবিতাটি নজরুল ইসলামের নিজস্ব নয়। কবিতাটি Whitman-এর "Bird of Passage"-গ্রন্থের "Pioneers ! O Pioneers"-কবিতাটির ভাষান্তরিত রূপ মাত্র। দু'টি কবিতা পাশাপাশি রেখে প'ড়লে **অনুবাদের** তথ্যটি স্পষ্ট হবে।

ইংরেজী কবিতার প্রথম স্তবক—

"Come my tan-faced children
Follow well in order, get your
weapons ready,
Have you your pistol ? have
your sharp-edged axes.
Pioneers! O Pioneers !"

বাংলা কবিতার প্রথম স্তবক—

"অগ্রপথিক রে সেনাদল,
জোর কদম্ চল্‌রে চল্।

www.pathagar.com

রৌদ্র দগ্ধ মাটিমাখা মোর ভাইরা শোন্
বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর!
রাখ তৈয়ার হাথেলিতে হাতিয়ার জোয়ান
হান্‌রে নিশিত পশপতাস্ত্র অগ্নিবাণ!
কোথায় হাতুড়ি কোথা শাবল?
অগ্রপথিক রে সেনাদল,
জোর কদম্, চল্‌রে চল্।"

ইংরেজীর অল্প-পরিসরের অনেক কথা বাংলার দীর্ঘ পরিসরে স্বল্প কথায় পরিণত হ'য়েছে। অনুবাদেও যথেষ্ট দৈন্য পরিস্ফুট হ'য়েছে। "Come my tan-faced children"—"রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা মোর ভাইরা শোন্"। "Follow well in order"-এর বাংলা হ'য়েছে—"জোর কদম্ চল্‌রে চল্। "Get your weapons ready" বাংলায় হ'য়েছে—"রাখ তৈয়ার হাথেলিতে হাতিয়ার জোয়ান"। আর সর্বশেষ Pioneers -এর বাংলা—"অগ্রপথিক রে সেনাদল!"[১৮]

বলা আবশ্যক, সৈয়দ আলী আহ্‌সান "এত সুন্দর কবিতাটি নজরুল ইসলামের নিজস্ব নয়" ব'লে, তাঁকে যে চুরির অপবাদ দিয়েছেন—তা একটি information gap মাত্র। কারণ কবি 'অগ্রপথিক' কবিতাটি, পত্রিকায় প্রকাশের প্রথম সুযোগেই পাদটীকায় জানিয়ে দেন—"হুইটম্যানের অনুরণনে"। যে-কোন সমালোচকের-ই উচিত, পাদটীকার এই শেষ শব্দ দু'টির প্রতি সচেতন থেকে হুইটম্যানের 'পাইয়োনিয়ার ও পাইয়োনিয়ার' কবিতার সঙ্গে নজরুল ইসলামের 'অগ্রপথিক' কবিতার তুলনা করা। কারণ কবি স্পষ্ট ব'লেছেন—তিনি হুইটম্যানকে অনুবাদ ক'রছেন না অনুসরণও নয়; অনুরণন ক'রছেন মাত্র। কবি ঠিক-ই ব'লেছেন এবং ক'রেছেন। কারণ হুইটম্যানের কবিতাটি হুবহু অনুবাদ ক'রলে, তা যে 'অগ্রপথিক' থেকে বেশী সুন্দর এবং বেশী পাঠযোগ্য হ'ত—তা বলা চলে না। এজন্য 'অগ্রপথিক'—'পাইয়োনিয়ার! ও পাইয়োনিয়ার' কবিতার "ভাষান্তরিত

www.pathagar.com

রূপ মাত্র" নয়। তরজমার অছিলায় এ-এক নয়া সৃষ্টি। "অনুবাদের যথেষ্ট দৈন্য" তো দূরের কথা, কবিতাটিকে অনুবাদ-কবিতা ব'লেও গণ্য করা উচিত নয়। তরজমার অছিলায় এক নয়া সৃষ্টি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, যেটুকু 'অনুরণন'-সাদৃশ্যের জন্য কবি নজরুল ইসলামের এ-কবিতাকে সৈয়দ আলী আহসান "ভাষান্তর মাত্র"বা 'দীন-অনুবাদ' বলেছেন—তার থেকে অনেক বেশি (বা হুবহু) সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতা ও গল্প আদৌ ভাষান্তর বা 'অনুবাদ'ব'লে নির্দেশিত হয়নি। কবি নিজেও সেগুলোকে—'অনুবাদন';, 'অনুসরণ', 'অনুরণন' কোন-কিছু বলেই উল্লেখ করেননি। তাঁর সমালোচকরাও নয়।

এপরিপ্রেক্ষিতে, মরহুম সৈয়দ আলী আহসান পূর্বোক্ত দু'টি কবিতার প্রথম স্তবকদ্বয়ের তুলনা ক'রে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাটিকে যেরূপ নিকৃষ্ট ব'লতে চেয়েছেন—তা সমর্থনযোগ্য নয়। হুইটম্যানের কবিতার প্রথম স্তবক অপেক্ষা নজরুল ইসলামের কবিতার প্রথম স্তবক অনেক বেশী কাব্য সময়, স্নিগ্ধ, হার্দ্য এবং মনোমুগ্ধকর। 'পায়োনিয়ার' বা পথ প্রদর্শক 'অগ্রপথিক' ব'লে যথার্থ শব্দচয়ন-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন কবি। হুইটম্যান—'তামাটে মুখ' শিশুদের এগিয়ে আসতে ব'লেছেন। অন্য দিকে নজরুল সে-কথা ঘুরিয়ে নিজের মত ক'রে ব'লেছেন—"রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা মোর ভাইরা শোন্"। এর কোন্ শব্দটি ভাষান্তর? আমেরিকান কবি, পথ-প্রদর্শকদের শিশু সন্তান ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন এবং তাদের সঙ্গে আত্মযোগ ক'রতে পারেননি, পক্ষান্তরে বাঙালী কবি নজরুল ইসলাম অগ্রপথিকদের সেনাদল বলে সৎম্বাধন ক'রে—তাদের সঙ্গে আত্মযোগ ক'রতে এবং তাঁদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রেরণা দিতে সমর্থ হয়েছেন। "Follow well in order" শৃঙ্খলার সঙ্গে অনুসরণ কর; এ আদেশ-এর বদলে "জোর কদম চল্‌রে চল্" উচ্চারণ হ'য়েছে—অনেক বেশী জীবন্ত ও বেগবান। "Get your weapons ready" বা 'রাখ তোমার অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত'কে—

www.pathagar.com

"রাখ তৈয়ার হাথেলিতে হাতিয়ার জোয়ান" বলাও কি অধিক সজীব, মিষ্ট ও বেগবান ভাষান্তর নয়? আর "Have you your pistol ? Have your sharp-edged axes" কে 'হান রে নিশিত পশুপতাস্ত্র অগ্নিবাণ। কোথায় হাতুড়ি কোথা শাবল?' না লিখে—"নিয়েছ তোমার পিস্তল? নিয়েছ ধারালো কুঠার সব"—লিখলেই কি বেশি ঠিক ও সুন্দর অনুবাদ হ'ত? নিশ্চয়-ই নয়। অধিকন্তু, কবি নজরুল ইসলামের 'অগ্রপথিক' কবিতার প্রথম স্তবকের বিভিন্ন স্থানে যে ধ্বনি-মধুর অনুপ্রাস সৃষ্টি হ'য়েছে—তা ইংরেজী অপেক্ষা বাঙালা কবিতাটিকে আরও বেশী সংগীতময় ক'রে তুলেছে। যেমন—দ্বিতীয় পংক্তিতে র, ম, ল, ল, (জোর্ কদম্ চল্‌রে চল্); পরবর্তী পংক্তিতে—দ+দ, মা+মা, র+র (রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন্ ভাইরা মোর); তার পরের পংক্তিতে—সি-সু, ব-ভি, (বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর) ইত্যাদি বর্ণ ও ধ্বনির অপূর্ব ব্যবহার কবিতাটিকে হুইটম্যানের 'অনুবাদ' থেকে 'নব সৃজনে' উত্তরণ ঘটিয়েছে। কবি সচেতনভাবেই তা' ক'রেছেন ব'লেই কবিতাটিকে তিনি মূল কবিতার অনুরণন ব'লেছেন। কিন্তু স্তবকটির সব থেকে সুন্দর পংক্তিটি সম্ভবতঃ "হান রে নিশিত পশু-পতাস্ত্র অগ্নিবাণ।" মূলে এর একটি শব্দও দেখানো যাবে না। আমেরিকান কবিতাটি যদি কেউ মূলও ধরেন, তথাপি এখানে এসে তিনি অবশ্যই স্বীকার ক'রবেন যে, কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমেরিকান-কবির অনুভূতি ও প্রকাশ-ভঙ্গিকে—বাঙালী কবির অনুভূতি ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে সার্থক ও সজীবভাবে রূপান্তর ক'রে দিয়েছেন। কেন তিনি এটা ক'রেছেন, তা নিশ্চয় তাঁর অনুবাদ সম্পর্কীয় পূর্বোক্ত বক্তব্য স্মরণ ক'রলেই বোঝা যাবে। কিন্তু এ-সম্পর্কে সাময়িক অসচেতনতার জন্য সৈয়দ আলী আহসান "অগ্রপথিক" কবিতার অনুবাদ-আলোচনায় সর্বত্র সুবিচার ক'রতে সমর্থ হননি।

তিনি হুইটম্যানের ঐ কবিতার দ্বিতীয় স্তবক কোট্ ক'রে আরও আলোচনা ক'রতে লিখেছেন—

www.pathagar.com

"For we cannot torry here
We must mach my darlings,
We must bear
the brunt of danger,
We the youthful sinewy races,
all the rest on us depend,
Pioneers! O Pioneers!"

বাংলা কবিতার দ্বিতীয় স্তবক:

"কোথায় মানিক ভাইরা আমার সাজরে সাজ!
আর বিলম্ব সাজে না, চালাও কুচ্‌কাওয়াজ!
আমরা নবীণ তেজ-প্রদীপ্ত বরি তরুণ
বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন!
আমরা ফলাব ফুল-ফসল
অগ্রপথিক রে যুবাদল—
জোর কদম্ চল্ রে চল্ ॥

"We must march, my darlings" বাংলায় রূপ নিয়েছে—"কোথায় মানিক ভাইরা আমার সাজ রে সাজ। "We must bear the brunt of danger" বাংলায় হয়েছে—"বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিড়িয়া শুষিব খুন" এবং "We the youthful sinewy races"—"আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ"।[১৯]

উল্লেখযোগ্য যে, মূলের প্রথম চরণ বাঙালা রূপান্তরে দ্বিতীয় চরণ রূপে দেখা দিয়েছে। কবি অনুবাদে মূল ভাবস্রোতের গতিময়তা সৃষ্টির জন্যই মূলের প্রথম চরণকে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় চরণকে প্রথমে স্থান দিয়েছেন। তাছাড়া "My darlings"-এর বাঙালা রূপান্তরে "মানিক ভাইরা" চমৎকার ভাবে মানিয়েছে। এক-ই ধরনের ঘটনা ঘটেছে পরবর্তী দু'পংক্তিতেও। মূলের "We must bear the brunt-of anger-এর রূপান্তরে "বিপদ-বাধা"কে Personify ক'রে কবি যে-

www.pathagar.com

অলংকার সৃষ্টি ক'রেছেন—তা মূলকে সজীব ও কাব্যরসময় ক'রেছে এবং এ-চরণ অনুবাদ-অনুসরণ না হ'য়ে নব সৃষ্টি হ'য়ে উঠেছে। এক-ই ভাবে, জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে—"We the youthful sinewy draces" আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ"-এ। মূলের দু'পর্যায়ের বাগ্-বিন্যাসের স্থানে বাঙালায় তিন পর্যায়ের বাগ-বিন্যাস শুধু সুন্দর হ'য়ে ওঠেনি; ছন্দ-দোদুল ও হ'য়ে উঠেছে। আর "আমরা ফলাব ফুল-ফসল" মূলে আছে কি?এটি অনুবাদ; অনুসরণ নয়; অনুরণনের পুষ্পল ফাউ! সৃজনশীল অনুবাদের পরিচয় তো এখানেই।

জনাব সৈয়দ আলী আহসান এর পর 'অগ্রপথিক'-এর তৃতীয় স্তবক সম্পর্কেও আলোচনা ক'রেছেন। তবে মূল ও তার বাঙালা রূপান্তরের কোনটাই কোট্ করেননি। শুধু লিখেছেন—"তৃতীয় স্তবকে বিদেশী কবি প্রতীচির যুব-শক্তির জয়গান ক'রেছেন—তারা চঞ্চল, কর্মদক্ষ, মানুষিক গর্ব ও বন্ধুত্বের আবেগে উজ্জ্বল, সর্বজনের সম্মুখগামী অগ্রপথিক। নজরুল ইসলাম "Western youths" কে "প্রাচীর তরুণ"-এ রূপান্তরিত করেছেন, কিন্তু প্রতীচির তরুণদের প্রতি আরোপিত বিশেষণগুলি সর্বাংশে বজায় রেখেছেন। শুধুমাত্র "মরুসঞ্চর গতি-চপল" কথাটি নজরুল ইসলামের নিজস্ব। কথাটি অবশ্য সুন্দর—দক্ষ শিল্পীর পরিচয় বহন ক'রছে।"[২০]

ন্যায়-সংগত কাব্য-বিচারের জন্য এখানে মূল ইংরেজী কবিতা ও তার বাঙালা অনুবাদ উদ্ধৃত হ'ল।

"O you youths, Western youths,
So impatient, full of action,
full of manly pride and friendship
Plain I see you Western youths
see you tramping with the
foremost
Pioneers! O pioneers!!"

www.pathagar.com

এ-স্তবক নজরুল-রচনায় নিম্নরূপ অবয়ব লাভ ক'রেছে।

"প্রাণ-চঞ্চল প্রাচীর তরুণ কর্মবীর
হে মানবতার প্রতীক গর্ব উচ্চশির!
দিব্য চ'ক্ষে দেখিতেছি তোরা দৃপ্ত পদ
সকলের আগে চলিবি পারায়ে গিরি ও নদ
মরু-সঞ্চর গতি-চপল
অগ্রপথিক রে পাওদল
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্।"

লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্য তরুণদের "প্রাচীর তরুণ" ব'লে উল্লেখ ক'রে, কবি কোন অন্যায় করেননি। কারণ তিনি এখানে শব্দান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়েরও অনুবাদ ক'রেছেন। অনুরণিত কবিতার এটা দোষ নয়। এমন কি, পুরোপুরি অনুবাদও যদি বলা হয়, তবু নয়। তিনি পশ্চিমা তরুণদের জন্য প্রযোজ্য বিশেষণ গুলোও প্রাচীর তরুণদের প্রতি আরোপ ক'রে অন্যায় করেননি। কারণ চঞ্চলতা দক্ষতা, গর্ববোধ, বন্ধুত্বের আবেগ-অনুভব ইত্যাদি সর্ব দেশের সর্ব কালের তরুণদের মধ্যেই কম-বেশি বর্তমান। এগুলো বাঙালী তরুণদের মধ্যে যে অধিক বিদ্যমান—তাও সত্য। অতএব, অনুরণিত কেন, খাঁটি অনুদিত কবিতাতেও ঐ সব বিশেষণ বর্জন করার কোন সুযোগ ছিল না। সমগ্র স্তবকটি লক্ষ্য ক'রে বরং বলা যায়,কবি দ্বিতীয় পংক্তির "So impatient" এবং "Full of action"-কে যথাক্রমে "প্রাণ-চঞ্চল" ও "কর্মবীর" ব'লে অনুবাদ করায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মুর কবিতার তৃতীয় পংক্তির "Full of manly pride and friendship"-কে 'মানবোচিত বন্ধুত্ব ও গর্ববোধপূর্ণ'কে মানবতার প্রতীক গর্ব উচ্চশির এবং "Plain I see you" বা 'সহজ চোখে দেখছি আমি'কে "দিব্য চ'ক্ষে দেখিতেছি" রূপে অনুবাদ যেমন উৎকৃষ্ট, তেমনি রসঘন উচ্চারণেও পরিণত হ'য়েছে। এক-ই ভাবে, "See you tramping with the foremost"-কে....."তোরা

www.pathagar.com

দৃপ্তপদ/সকলের আগে চলিবি পারায়ে গিরি ও নদ" রূপে ভাষান্তর এবং তার সঙ্গে "মরুসঞ্চর গতি-চপল" বিশেষণ যোগ, সৃজনশীল অনুবাদ-কর্মের-ই চরম পরাকাষ্ঠা ব্যতীত কিছু নয়।

জনাব সৈয়দ আলী আহসান আরও লিখেছেন—"পরবর্তী স্তবকে মূলের সৌন্দর্য ভাষান্তরিত হ'য়ে অব্যাহত থাকেনি। ফলে, যে জিজ্ঞাসা র'য়েছে, আবেগপ্রবণ মনের নতুন পথ গ্রহণের যে উৎকণ্ঠা ও স্পৃহা র'য়েছে,—বাংলায় তা স্থির অগভীর ভাষণে পরিণত হ'য়েছে। তারা কি তাদের শিক্ষাদানের অধিকার শেষ ক'রেছে? ক্লান্তিতে তারা কি আজ আনত শির?—অক্ষয় ব্রতের অধিকার আমরা পেয়েছি। সে অধিকারের ভার আমাদের বহন ক'রতে হবে,—শিক্ষাদানের অধিকারও আমাদের জন্য সত্য। নজরুল ইসলাম লিখলেন :

"স্থবির শান্ত প্রাচীন প্রাচীর জাতিরা সব
হারায়েছে আজ দীক্ষা দানের সে গৌরব
অবনত শির গতিহীন তারা—মোরা তরুণ
বহিব সে ভার লব শাশ্বত ব্রত দারুণ
শিখাব নতুন মন্ত্রবল।"[২১]

লক্ষণীয় যে, সমালোচক মহোদয় এখানেও মূল স্তবক মূল ভাষায় কোট্ করেননি। সেটি নিম্নরূপ—

"Have the elder races halted?
Do they droop and end their lesson, wearied
Over there beyond the seas!
We take up the task eternal, and the
burden and the lesson
Pioneers! O Pioneers!"

এ-অংশের পূর্বোক্ত নজরুলকৃত অনুবাদকে—"স্থির, অগভীর ভাষণ" বলা যায় কি ভাবে; তা বুঝে ওঠা কঠিন। আমাদের বিবেচনায়—

www.pathagar.com

নজরুল ইসলাম মূলের সৌন্দর্যকে শুধু অব্যাহত রাখেননি; তাকে ছন্দের গতি ও অলংকার নৈপুণ্যে বিশেষতঃ অনুপ্রাস-ব্যঞ্জনায় অত্যন্ত চমৎকার কাব্যরূপও দান ক'রেছেন। কবি এ-স্তবকে কল্পনার গতি, ছন্দের প্রবাহ এবং Word-painting-এ যে-দক্ষতা দেখিয়েছেন—তা অতুলনীয়।

'অগ্রপথিক'-এর পঞ্চম স্তবক সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসান-এর বক্তব্য—"পঞ্চম স্তবকে Whitman শক্তিমন্ত, নবতম ও বিচিত্রতর পৃথ্বীসৃজনের যে-কথা ব'লেছেন, আবেগ-উজ্জ্বল সে-ভাষণের অনুবাদ হয় না। "We debouch upon a newer mightier world, varied world, fresh and strong the world we seize, world, of labor and the march"-এর রূপান্তর ঘ'টেছে এভাবে :

"আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত,
গিরিগুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর বীর্যবান,
তাজা-জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান
চলমান বেগে প্রাণ উছল।"[২২]

বলা আবশ্যক, কোন বিবেচনাতেই উক্ত অনুবাদকে আবেগহীন বা দুর্বল বলা যায় না। মূলের তিনটি পংক্তিকে কবি নজরুল ইসলাম অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পাঁচটি সুন্দর পংক্তিতে ধ'রে দিয়েছেন। এ-স্তবকের শেষ তিনটি চরণের কাব্য সৌকর্য ও ছন্দ-মাধুর্য অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

আলোচ্য কবিতার ষষ্ঠ স্তবক সম্পর্কে সমালোচক মহোদয় লিখেছেন—"ষষ্ঠ স্তবকে উন্নত-শীর্ষ পর্বত অতিক্রম ক'রে; অধিত্যকা, উপত্যকা ও দিগন্ত প্রসারী প্রান্তর পশ্চাতে রেখে, পদ চিহ্নহীন, অপরিচিত পথে—বিজয়ের ও অধিকারের স্বাক্ষর রেখে যাবার কাহিনী পাই। অগ্রগামী সে-পথিককে নজরুল ইসলাম ব'লেছেন "অভিযান সেনা"।[২৩]

www.pathagar.com

কবিতাটির ষষ্ঠ স্তবক সম্পর্কে এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত ও অগভীর। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে মূল স্তবক ও তার বাঙালা রূপান্তর উদ্ধৃত হ'ল।

"We detachment steady throwing
Down the edges through, the passes , of the
mountains steep,
Conquering holding daring venturing
as we go the unknown ways,
Pineers! O Pioneers!!"

নজরুলকৃত এর বাঙালা 'অনুবাদ'—

"অভিযান-সেনা আমরা ছুটিব দলে দলে
বনে নদী তটে গিরিসঙ্কটে জলে-থলে
লঙ্ঘিব খাড়া পর্বতচূড়া অনিমিষে
জয় করি সব তছনছ করি পায়ে পিষে
অসীম সাহসে ভাঙি আগল
না জানা পথের নকীবদল
জোর কদম্ চল্‌রে চল্ ।"

মূল স্তবকের Detachment-কে সৈন্যদল অর্থে "অভিযান-সেনা" বলায় কোন অন্যায় করা হ'য়েছে— বলা যায় না। বরং এই স্তবকটির মূলও যেমন কাব্যরসময় ও শিল্পগুণ সমৃদ্ধ—নজরুলকৃত রূপান্তরও তাই। বরং আরও বেশি সুন্দর ও শিল্প-সার্থক। কারণ বাঙালা স্তবকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের মধ্যে যে-অনুপ্রাস-অলংকার ফুটে উঠেছে—যেমন—

"গিরি সঙ্কটে"—
"লঙ্ঘিব খাঁড়া" ও
"পর্বত চূড়া"—

www.pathagar.com

তা যেমন সুন্দর, তেমনি মধুর। আর ষষ্ঠ চরণের "নকীব" শব্দটি কি মূল অপেক্ষা অধিক কাব্যময়তা সৃষ্টি করেনি? তা ক'রেছে ব'লেই আমাদের মনে হয়।

বলা আবশ্যক, 'অগ্রপথিক' ও নজরুল ইসলাম সম্পর্কে মরহুম সৈয়দ আলী আহ্সানের মূল্যায়ন এর পর বিপরীত প্রবাহ লাভ ক'রেছে। তিনি ঐ কবিতার প্রথম ছ'টি স্তবকের প্রতি বিরূপ মনোভঙ্গি প্রকাশ ক'রলেও, তারপর লিখেছেন—"একটা কথা স্পষ্ট যে, নজরুল ইসলাম আপন মনের গতিপ্রবাহের সঙ্গে একান্ত তুলনীয় ভেবেছিলেন Whitman-এর মানবাত্মার স্পর্ধিত নিঃশঙ্ক পদচারণ। তিনি তাঁর পদচিহ্ন ধ'রে যৌবনের অপ্রমেয় সাধনার তূর্যবাদক হ'তে চেয়েছেন। অনুকরণের এ-অভীপ্সার মধ্যে কবির দুর্দমনীয় জীবন-বেগের স্ফূর্তি র'য়েছে। পশ্চিমের অ-নমনীয় যুবশক্তির বন্দনা-গান রচনা ক'রেছেন আমেরিকার কবি,—আর আমাদের কবি—প্রাচ্যের অনিশ্চল তারুণ্যের মুক্তি-সংগীত গেয়েছেনঃ

"আমরা এসেছি নবীন প্রাচীর নব স্রোতে
ভীম-পবর্ত ক্রকচ গিরির চূড়া হ'তে,
উচ্চ অধিত্যকা প্রণালিকা হইয়া পার
আহত বাঘের পদ-চিন্ ধরি হ'য়েছি বার;
পাতাল ফুঁড়িয়া পথ-পাগল।
অগ্রবাহিনী পথিক দল।
জোর কদম চল্ রে চল্॥"

উপরের উদ্ধৃতিতে জীবনের যে-মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ গতি র'য়েছে—বস্তুর সম্পর্কে এসে যা দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, মূল ইংরেজী কবিতায় কিন্তু তার পরিচয় নেই। Whitman যেখানে বলেছেন "From the hunting trail we come," নজরুল ইসলামের রচনায় সেখানে র'য়েছে—"আহত বাঘের পদ-চিন্ ধরি হ'য়েছি বার"। বাংলা উপমার মধ্যে জীবনের যে নিঃশঙ্ক পদক্ষেপের ইঙ্গিত পাই; ইংরেজীতে তা

www.pathagar.com

নেই।"[২৪] একথা সত্য।

সৈয়দ আলী আহ্সান আরও জানিয়েছেন—"উভয় কবির কল্পনা, চিন্তার গতি, বাক্য-সংযোজনা ও স্পন্দনের মধ্যে যেখানে অমিল দেখা যায়, সেখানে নজরুল ইসলামের রচনার মধ্যেই উন্নততর কবি-মানসের পরিচয় মেলে। এর এক মাত্র কারণ হ'ল এই যে, যেখানে নজরুলের বিপ্লবাত্মক ভাব-কল্পনার সঙ্গে হিন্দু-দর্শন ও পুরাণের সংযোগ র'য়েছে, বিদেশী কবি সেখানে যন্ত্রযুগের শক্তিমত্তার সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজেছেন। যে-কাহিনী দীর্ঘদিনের ইতিহাস সৃজন করেনি, তা কখনও ঐতিহাসিক চেতনার উৎস হ'তে পারে না। কলরবমুখর বর্তমানের বিশৃঙ্খলার সত্য কাহিনী যদি লিখতে হয়,তবে আদিম যুগের প্রথম কোলাহলকে স্মরণে আনতে হবে। Whitman-এর রচনায় একমাত্র বর্তমান সত্য র'য়েছে, গভীর দিব্যানুভূতির অভাবে তার তথ্যের পরিবেশন সার্থক হয়নি। Witman লিখেছেন:

"Raise the mighty mother mistress.
Waving high the delicate mistress over,
all the starry mistress
(bend your heads all),
Raise the fang'd and warlike mistress, stern,
impassive weapond mistress,
Pioneers! O Pioneers!"

এখানে কাব্য নেই। জীবন-দর্শনের অভাবে গদ্যাত্মক বাচনভঙ্গিতে কবির রস-নিবেদন সার্থক হয়নি। অথচ নজরুল ইসলাম হিন্দু পুরাণে ঐতিহ্যগত নির্ভরতার জন্যই যথার্থ কাব্য সৃজন ক'রতে পেরেছেন:

"তরুণ—তাপস! নব শক্তিরে জাগায়ে তোল্
করুণার নয়—ভয়ঙ্করীর দুয়ার খোল্।
নাগিনী-দশনা রণ-রঙ্গিনী শস্ত্রকর
তোর দেশমাতা, তাহারি পতাকা তুলিয়া ধর।

www.pathagar.com

রক্ত পিয়াসী অচঞ্চল
নির্মমব্রত রে সেনাদল!
জোর কদম চল্ রে চল্!"

পরিবর্তিত রূপে নজরুলের রচনায় উন্নততর কাব্য-সৃজনের আরো পরিচয় র'য়েছে। Whitman যেখানে ঘূর্ণ্যমান সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে গ্রহতারার পরিভ্রমণ ও দিনরাত্রির বিবর্তনের কথা ব'লেছেন, সেখানে নজরুল ইসলাম—স্বপ্নাতুর রাত্রির আচ্ছন্ন প্রহরের কথা সংযোগ ক'রেছেন। একজনের তথ্যের রূপায়ণে কাব্যের নিবৃত্তি র'য়েছে, অন্যের হাতে সেই তথ্য সত্যিকার কাব্যে উচ্ছ্বসিত হ'য়েছে। Whitman নিছক কল্পনার ব্যাপকতায় স্বপ্নময় মায়াবী রাত্রির কথা ব'লেছেন, কিন্তু নজরুলের কল্পনায় অনুভূতির স্পন্দন র'য়েছে, তাই "আলো ঝলমল দিবস" ও "স্বপ্নাতুর" রাত্রি-ই তাঁর কাহিনীর শেষ নয়—সেখানে "বন্ধুর মত ছেয়ে আছে সবে নিকট-দূর"।[২৫]

জনাব সৈয়দ আলী আহ্সানের এই অভিমত প্রশংসনীয়। তিনি কবিতাটির প্রথমাংশের মূল্যায়নকালে অপ্রসন্ন মনে কলম ধারণ করেন ব'লেই তাঁর বক্তব্যে স্ববিরোধ লক্ষণীয়। 'নজরুল অন্য কবির লেখা অনুবাদ ক'রে, তার ঋণ-স্বীকার করেননি'—এই ভেবেই তিনি কবিতাটি আলোচনার প্রাক্কালে লেখেন—"Whitman-এর প্রভাব নজরুল ইসলামের উপর অত্যন্ত বেশী স্পষ্ট, দীপ্ত ও প্রত্যক্ষ। বিদ্রোহ, বিপ্লব ও যৌবনের আবেগ যেখানে তাঁর কাব্যের উপপাদ্য হ'য়েছে, সেখানেই তিনি Whitmanকে অনুসরণ ক'রেছেন নিঃসঙ্কোচে। এ-অনুসরণের মধ্যে গ্লানির কিছু থাকতো না, যদি তা' শুধুমাত্র ভাবগত একাত্মতা বুঝাত। আমরা সেক্ষেত্রে ব'লতাম যে, উভয় কবির মধ্যে একটি আদর্শগত ঐক্য আছে। কিন্তু নজরুল ইসলাম শুধুমাত্র যে অনুসরণ ক'রেছেন তাই নয়, তিনি অনুকরণ ক'রেছেন এবং শেষ পর্যন্ত অনুবাদও ক'রেছেন, অথচ তার স্বীকৃতি কোথাও নেই।"[২৬] সমালোচক মহোদয়ের গ্রন্থে পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে এ-অভিযোগ তিন বার উত্থাপিত

www.pathagar.com

হ'য়েছে। এ থেকেই তাঁর অপ্রসন্নতার কারণ বোঝা যায়। অথচ ব্যপারটা যে সত্য নয়; বরং তা সমালোচকের information gap মাত্র; সে-বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হ'য়েছে।

অতঃপর বলা দরকার, Whitman-এর প্রভাব নজরুল ইসলামের উপর খুব বেশি বলা সংগত নয়। কারণ 'পাইয়োনিয়ার! ও পাইয়োনিয়ার'! ব্যতীত তাঁর অন্য কোন রচনার প্রভাব নজরুল ইসলামের অন্য কোন রচনায় লক্ষণীয় নয়। 'হুইটম্যানের' "Song of Myself" সৈয়দ আলী আহ্সান, নজরুল ইসলামের বিদ্রোহীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। তাতে কোন কোন স্থানে উভয় কবির সাযূজ্যও দেখিয়েছেন। কিন্তু "Song of Myself" ও 'বিদ্রোহী' এক নয়। অতটুকু সাযূজ্য "Song of Myself"-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" থেকেও দেখানো যেতে পারে। সেজন্য সৈয়দ আলী আহ্সানের কথার প্রতিধ্বনি ক'রেই বলা যায় যে—উভয় কবির আদর্শ ও মেজাজগত একাত্মতার কারণে ঐটুকু সাযূজ্য লক্ষণীয়।

বিদ্রোহী কবি ইংরেজী গদ্য থেকে আর যে-সব অনুবাদ ক'রেছেন, সে সব রচনার মূল না পাওয়ায়—তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব নয়।

বাঙালা ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ

বহু ভাষাভিজ্ঞ কবি কাজী নজরুল ইসলাম আরবী,ফারছী, পশ্তু ও ইংজেরী ভাষা থেকে বাঙালা ভাষায় যে-সব কাব্য, কবিতা, গান ও সংবাদ-নিবন্ধ অনুবাদ ক'রেছেন, ইতোপূর্বে তার বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে। অন্যপক্ষে, কবি স্বভাষা থেকে নিজের রচনাও যে অন্য ভাষায় রূপান্তর ক'রেছেন—এবার সে-সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

ক. বাঙালা থেকে হিন্দী

অল্পকাল আগে আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জানা যায়, কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিজের রচনা (বাঙালা) হিন্দী ভাষায় অনুবাদ ক'রেছেন।

www.pathagar.com

ইতোপূর্বে এ-সম্পর্কে মরহুম আবদুল আজিজ আল্-আমান যা লিখেছেন—তা পুনরায় স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন—"সংস্কৃত বর্ণ মিছিলের সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকলেও হিন্দীর সঙ্গে ছাত্র-জীবনে তাঁর কোন সংযোগ ছিল না, পরবর্তীকালে কবি ধীরে ধীরে এ-ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হন। শেষে এমন পারদর্শিতা অর্জন করেন যে, স্বরচিত সংগীতগুলির সাবলীল হিন্দী রূপান্তর মৌলিক সৃষ্টির মতই তার কাছে অনায়াস হ'য়ে উঠে। এমনকি, এ-ভাষাতে তিনি কিছু সংখ্যক মৌলিক সঙ্গীত এবং ন্যূনপক্ষে একটি রেকর্ড নাটিকা রচনা করেন। তাঁর এই হিন্দী জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পর্কে ব'লতে গিয়ে একজন প্রখ্যাত সুরকার অত্যন্ত বেদনাতুর কণ্ঠে আমাকে বলেন: বোম্বাই চিত্রজগতে আজ বাঙ্গালী সুরকারদের যে দাপট এবং কদর (শচীন দেব বর্মণ তখন জীবিত), নজরুল সক্রিয় থাকলে তাঁর সাম্রাজ্য এবং আধিপত্যে এঁরা নিষ্প্রভ হ'য়ে থাকতেন এবং যে অর্থের টানাটানিতে সারাজীবন পীড়িত হ'য়েছেন তিনি—তা হয়তো দূর হ'য়ে যেত চিরদিনের জন্য।"[২৭]

আবদুল আজিজ আল্-আমান নজরুল ইসলামের ২৬টি হিন্দী গানের খবর দিয়েছেন। উক্ত ২৬ টি গানের মধ্যে পাঁচটি গান স্বরচিত বাঙালা গানের রূপান্তর বা অনুবাদ। নিম্নে উক্ত পাঁচটি গান ও সেগুলোর হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হ'ল।

বাঙালা মূল—

"বিকাল বেলার ভূঁইচাঁপা গো
সকাল বেলার জুঁই,
কারে কোথায় দেব আঁচল
তাই ভাবি নিতুই॥

ফুলদানিতে রাখব কা'রে
কা'রেই বা দিই কণ্ঠ-হারে
কারে দেব দেবতারে

www.pathagar.com

সমান প্রিয় দুই॥

সমান অভিমানী ওরা
সমান সুকোমল
চাঁপা আমার চোখের আলো
জুঁই চোখের জল।

বর্ষামুখর শ্রাবণ-রাতি
তারি আমি রুধির (?) সাথী
চৈতী রাতের চাঁপায় চাহি,
প্রিয় আমার দুই।"

এ-গানের কবিকৃত হিন্দী রূপান্তর—

"বিকাল বেরকী চম্পা আউর
সবেরা কি যুঁইন।
কিসকা কঁহা রাকু য়্যহী
সোচ্না হরয়্যেক দিন॥

(গুলদাণি) ফুলদানী মে রাখুঁ কি সে
গলে কী হার করু কিসে
দেওতা কো ম্যয় দুঙ্গা কি সে
(কি সে) দিল্ মে রাখুঁ মৈঁন্॥

অভিমানী উন দোনো মুলায়েম বরাবর
চম্পা মেরী আঁখ কি রোশ্নী
জুঁইন্ আঁখ কি লোর।

বরখে বাদর শাওন মে যব
যুঁইন কে সাথ রোতা হুঁ তব
চৈতী রাত মে চাহুঁ চম্পা
প্যার কঁরু দো মৈঁন্॥"[২৮]

www.pathagar.com

(২)

বাঙালা মূল—

"চঞ্চল সুন্দর নন্দকুমার
গোপী চিত-চোর প্রেম মনোহর
নওল কিশোর ।
অন্তর মাঝে বাজে বেণু তার ।
নন্দ কুমার! নন্দ কুমার!! নন্দ কুমার!!!

শ্রাবণ আনন্দ নূপুর ছন্দ রুণু ঝুণু বাজে
নন্দের আঙিনায় নন্দন চন্দ
নাচিছে হেলেদুলে গোপাল সাজে ॥

টলমল টলে রাঙা পদতলে
লঘু হয় বিপুল ধরণীর ভার
নন্দ কুমার! নন্দ কুমার!! নন্দ কুমার !!!

রূপ নিহারিতে এল লুকায়ে দেবতা
কেহ গোপগোপী হ'ল
কেহ তরুলতা—
আনন্দ অশ্রু নদী হ'য়ে ব'য়ে যায়
উতল যমুনায়॥

প্রণতা প্রকৃতি নিরালা সাজায়
বন-ডালায় পূজা ফুল-সম্ভার
নন্দ কুমার! নন্দ কুমার!! নন্দ কুমার!!!"

এ-গানের হিন্দী রূপান্তর—

"চঞ্চল সুন্দর নন্দ কুমার
গোপী চিতচোর মনোহর
নওল কিশোর ।

www.pathagar.com

বাজতহি মন্ মে বাঁশরি কি ঝন্কার
নন্দ কুমার! নন্দ কুমার !! নন্দ কুমার !!!

শ্রবণ-আনন্দ বিছুয়া কি ছন্দ
রুণুঝুণু বোলে
নন্দ্কে আঙ্গন নামে নন্দন্ চন্দ্রমা-গোপাল
বন্ ঝুমত ঝুমত ডোলে।
ডগমগ ডোলে, রাঙ্গা পাঁউ বোলে
লঘু হো কে বিরাট ধরতী কা ভার
নন্দ কুমার ! নন্দ কুমার !! নন্দ কুমার !!!

রূপ নেহারনে আয়ে লুক ছিপ দেওতা
কোই গোপ গোপী বনা
কোই বৃক্ষ-লতা
নদী হো বহে লাগে আনন্দকে আঁসু
যমুনা জল সুঁ
প্রণতা প্রকৃতি নিরালা সাজায়ে
প্রজা কর্নে কো ফুল লিয়ে আয়ে বন্ডার।
নন্দ কুমার ! নন্দ কুমার !! নন্দ কুমার!!!

(৩)

বাঙালা মূল—

"নিশি না পোহাতে যেয়ো না যেয়ো না
দীপ নিভিতে দাও।
নিবু-নিবু প্রদীপ নিবুক হে পথিক
ক্ষণিক থাকিয়া যাও।
দীপ নিভিতে দাও ॥

আজও শুকায়নি মালার গোলাপ

www.pathagar.com

আশা-ময়ূরী মেলেনি কলাপ
বাতাসে এখনও জড়ানো প্রলাপ
বারেক ফিরিয়া চাও।
দীপ নিভিতে দাও ॥

ঢুলিয়া পড়িতে দাও ঘুমে অলস আঁখি
ক্লান্ততরুণ কায়,
সুদূর নহবতে বাঁশরী বাজিতে দাও
উদাস যোগিয়ায়॥

হে প্রিয় প্রভাতে তব রাঙা পায়
বকুল ঝরিয়া মরিতে চায়
তব হাসির আভায় তরুণ অরুণ প্রায়
দিক রাঙিয়ে দাও।
দীপ নিভিতে দাও ॥"

এ-গানের-ই হিন্দী রূপ—

"অভি নিশি রহি ন যাও ন যাও
দিয়া বুঝ্‌নে দো
বুঝ্‌তি হুয়ি দিয়া পিয়া বুঝ্‌নে দো
মুসাফির রহ্‌য়ো
দিয়া বুঝ্‌নে দো ॥

নিঁদ আলসী আঁখ রুদ্ধ হো নে দো
ক্লান্ত করুণ দেহ—
দূর নৌবৎ সে বাজনে দো বাঁশরী
উদাস যোগিয়া মেঁ।

না প্যারে তেরে চরণোঁ পর
গুল মৌৎ চাহে গীর কর।

www.pathagar.com

তেঁরা হসী কো নবারুণিমা সে
দিশা রংগায়ে দো।
দিয়া বুঝ্নে দো ॥

অভি মিলা বহা হাওয়া মে প্রলাপ
আশা-শিখা অভি না কৈলা কলাপ
অভি তাজা রহা হার মে গুলাব
জরা সা দেখ্কে যাও।
দিয়া বুঝ্নে দো ॥"[৩০]

লক্ষণীয় যে, এ-গানের ভাষান্তরে বড় রকম ওলটপালট ঘটানো হ'য়েছে। কবির মূল বাঙালা গানের দ্বিতীয় স্তবক হিন্দী রূপান্তরে তৃতীয় স্তবক, মূলের তৃতীয় স্তবক, ভাষান্তরে দ্বিতীয় স্তবক এবং মূলের চতুর্থ স্তবক ভাষান্তরে তৃতীয় স্তবকে রূপলাভ ক'রেছে। তাছাড়া, "নিবু-নিবু প্রদীপ" হ'য়েছে—"বুঝ্তি হুয়ি দিয়া", "ঢুলিয়া পড়িতে দাও ঘুমে অলস আঁখি" হ'য়েছে—"নিঁদ আলসী আঁখি রুদ্ধ হো নে দো"। বাঙালা মূল গানের দ্বিতীয় স্তবকের পংক্তি-সজ্জার-ই বদল ঘ'টেছে হিন্দী রূপান্তরে। তৃতীয় চরণ অনুবাদকালে হ'য়েছে প্রথম চরণ এবং প্রথম চরণ হয়েছে তৃতীয় চরণ। আর মূলের শেষ স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তির বিশেষ ফুল "বকুল" হ'য়েছে—নির্বিশেষ "গুল" (ফুল)। এ-স্তবকের প্রথম পংক্তির "প্রভাত" ও প্রথম স্তবকের চতুর্থ পংক্তির "ক্ষণিক" শব্দের কোন ভাষান্তর করা হয়নি।

এই-ই নজরুল ইসলামের অনুবাদ বা নব-সৃষ্টি।—যার তুলনা তাঁর নিজের রচনা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।

অতঃপর জানা দরকার—কবি, শুধু গুরুগম্ভীর গানকেই হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করেননি; হাল্কা ও হাসির গানও তিনি—বাঙালা থেকে হিন্দীতে ভাষান্তর ক'রেছেন। নজীর নিম্নরূপ—

www.pathagar.com

(৪)

বাঙালা মূল—

"আমার খোকার মাসী শ্রী অমুকবালা দাসী
মোরে দেখেই সর্বনাশী
ফেলে ফিক্ ক'রে সে হাসি'॥

তার চোখ প্রায় পুঁটী মৎস্যই
চেহারাও নয় জুৎসই
তাতে আছে তিনটী বৎসই
কিন্তু স্বাস্থ্যে খোদার খাসি ॥

সে খায় বটে পান জর্দা
আর চোহারাও মর্দা মর্দা
তবু বুঝ্লে কিনা বড়্দা
আমি তাকেই ভালবাসি ॥

শালী অর্থাৎ কিনা বৌ সে পনর আনাই
তারে দিয়ে একটা আনি দাদা ধ'রে যদি আনি
সে বৌ হয় ষোল আনাই।
দাদা কি বল?

আমি তারি লাগি জেলে
দাদা ম'রব ঘানি ঠেলে,
তারে নিয়ে ভাগ্বো রেলে
না হয় প'রব গলায় ফাঁসি ॥"

এর হিন্দী অনুবাদ—

"মেরে বেটে কি খালা
বিবি ঝাঁপ-ঝপক ঝালা।
খুব উস্কো দেখা ভালা

www.pathagar.com

ঢং উস্‌কা, হেয় নিরালা
উস্‌কি আঁখ বড়ি ধ্যয়লি
উস্‌কি সুরত হেয় আল বেলি
ভাইয়া হেয় বড়ি নবেলি
বাকী বদন হেয় এক ঘোটালা॥

খাতি পান মে হাঁ উয়ো জর্দা
উস্‌কা চেহারা মর্দা মর্দা
কল্‌হ্‌ কা জেয়সা বর্‌ধা
মেয় উস্‌কা হি মাত্‌ওয়ালা॥

শালি কো মোলকে জানা
বিবি পন্দর আনা
উস্‌কো দিয়া জব এক আনা
লায়ে বরকে পুরিয়া তানা।
বিবি হুয়ি উয়ো ষোল আনা।
বোলো ভাইয়া ক্যা বলো?
হু হু
সোতি রাত মে জাগা
আজ্‌ জিট জকটে জে ঠাণ্ডা
উস্‌কো রেল মে লে কে ভাগা
গোয়া গলে মে
ফাঁসি ডালা॥"[৩১]

আরও একটি হাসির গান—

(৫)

"ও—হো.....
আজকে হইব মোর বিয়া
কালকে আইমু বৌ নিয়া (রে)

www.pathagar.com

রইবা তোমরা ত্যাহাইয়া
(নি) বুঝ্‌লা গোপ্‌লা মুকুন্দ্যা॥

তাইরে নারে নাইরে না
রইমু ঘরে বাইরে না
বিহান সন্ধ্যা মাদান্যা
চইলা যাইব কোহান দ্যা॥
উঠমু কি গাছৎ গিয়া
উৎকা মাইরা ফাল দিয়া,
ভাই রে, হালায় পরাণ ডা
নাইচ্যা উঠছে এ্যাহন থ্যা॥

হউর-হাউরী পাইমু কাল
সুমুন্দি আর শালীর পাল
কইব মোরে জামাই গো
আর দুইডা দিন থাকুন গ্যা॥

খাইমু কি কি আরে শুনই
মাংস লুচি পাতক্ষীর দই
হায় রে তোমরা অভাগ্যা
চাট্‌বা চুকা কাসুন্দ্যা॥
ফুচ্‌কি দিয়া তোমরা চোর
দেখবার চাইবা বৌ রে মোর
রাখমু তারে ছপাইয়া
বস্তা হোগলা চাপুন্ দ্যা॥

তাইরে নাইরে নাইরে তাই
বৌরে ছাইর‍্যা বাইরে ভাই
থাকতে পরাণ আসুম না (ঘরে)
পইচ্যা হইমু ফাঁপুন্দ্যা॥"

www.pathagar.com

এ-গানের হিন্দী অনুবাদ নিম্নরূপ ক'রেছেন কবি—

"কালকে হোয়ি বিয়া হাম রে
পরশু আয়ি জুরুয়া ভাই্য়া
রহ্ যাইবা তু হকুয়া-ভকুয়া
মৌজ্ করব্ হাম মুহ্ তু তাকওয়া ॥

ভেজি হো হামকা সাস আওর সওরা
বঢ়িয়া ২ সুখঘর কাপড়া
হাসি ঠাঠোলি শালি করি হেঁ
রুঠর যব হামককে যামাই হেঁ ॥

ঘড়ি ঘড়ি সোমরস সে খাইর
মৌনী কে সোমরস সি লাইর
সাসু লিহে মোর বালাইয়া ।
সালি করি হে খেল-খিলাইয়া ॥

ঝাঁকত জয় তুই লোপ কে পাইব
মড়ই মে যোগীকে ছিপাইব
দেখন কো তু লোগ্ তরস্ বা
মৌজ ক'রব হাম মুহ্ তু তাকওয়া ॥"[৩২]

বস্তুতঃ পক্ষে, সচরাচর অনুবাদ ব'লতে যা বোঝায়—এই শেষোক্ত গানটি তা থেকে অনেক দূরে। এ-এক সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি। বিষয়বস্তু এক—কিন্তু রূপায়ণে সাযুজ্য সম্পূর্ণ 'দূর আস্ত্'। ভাবতে অবাক লাগে, হিন্দী ভাষায় একজন বাঙালী কবির কতটা দক্ষতা থাকলে ও-রকম একটা বাঙালা গানের এমন লোক-ভাষা-নির্ভর হিন্দী অনুবাদ বা রূপান্তরের অছিলায় নব সৃষ্টি করা সম্ভব।

উল্লেখ করা দরকার যে, নজরুল ইসলামের ২৬টি হিন্দী গানের আবিষ্কর্তা মরহুম আবদুল আজিজ আল্-আমান লিখেছেন—" এছাড়া

www.pathagar.com

আরো কয়েকটি গানের অনুবাদসহ আছে মৌলিক হিন্দি গান ও নাটিকা। লক্ষ্য করার বিষয়,নাটিকাটিতে যে হিন্দি ব্যবহৃত হ'য়েছে, তা একেবারেই গ্রাম্য কিন্তু কৌতুকবহ—যা নাটিকাটির পরিবেশ এবং বিষয়বস্তু বিকাশে বিশেষ সহায়ক।"[৩৩]

বস্তুতঃপক্ষে হিন্দী ও বাঙালা—উভয় ভাষাই কবি নজরুল ইসলামের মন-মানসিকতায় কিভাবে মিলে-মিশে একাকার হ'য়ে গিয়েছিল, তা তাঁর একটি খাতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রলে বোঝা যায়। আবদুল আজিজ আল্-আমান কর্তৃক আবিষ্কৃত ঐ খাতার যে ফটোমুদ্রণ প্রকাশিত হ'য়েছে—সে-খাতায় নিহিত ঐ বিশেষ বিষয়টির প্রতি তিনি সবার নজর আকর্ষণ ক'রে লিখেছেন—(ঐ খাতার) "হিন্দি পাণ্ডুলিপি অংশে ও লক্ষ্য ক'রলে দেখা যাবে, অনেকগুলি বাংলা গানের অনুপ্রবেশ। কখনো এক-ই পৃষ্ঠার এক দিকে হিন্দি অন্য দিকে বাংলা, কখনো বা হিন্দির মধ্যে বাংলা।" শুধু তাই নয়, উদ্ধৃত হিন্দী গানগুলো লক্ষ্য ক'রলেও দেখা যাবে, কবি এক-ই গানের এক-ই শব্দ যখন একাধিকবার ব্যবহার ক'রেছেন, তখন বানানের বৃত্ত অতিক্রম ক'রে গেছেন নিজের অজ্ঞাতেই। যেমন—"বিকাল বেরকী চম্পা" গানটিতে প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তিতে "যুঁইন" লেখা হয়েছে 'য'-দিয়ে; কিন্তু ঐ গানের-ই তৃতীয় স্তবকের তৃতীয় পংক্তিতে "জুঁইন" লেখা হ'য়েছে জ-দিয়ে। বিশেষজ্ঞগণ জানেন—বাঙালা ভাষায় এই বিশেষ ফুলের নামটি দু'টি 'জ' ('য' ও 'জ') দিয়ে লেখা হ'লেও হিন্দীতে "য"-দিয়ে লেখাই সাধারণ রীতি। এক-ই ঘটনা ঘ'টেছে কবির বিখ্যাত "অভি নিশি রহি ন জাও ন যাও" হিন্দী গানটির একেবারে প্রথম চরণেই। এ-থেকে বোঝা যায়—উভয় ভাষাই কবির নিকট মাতৃভাষায় পরিণত হ'য়েছিল বৈ কি!"

এর অপর নজীর হিসেবে কবির "চৌরঙ্গী" নামক চলচ্চিত্রেরও উল্লেখ করা সমীচীন। শেখ দরবার আলমের লেখা থেকে জানা যায়—ফজলী ব্রাদার্স-নির্মিত ও এস. ফজলী পরিচালিত "চৌরঙ্গী" নামক চলচ্চিত্র,

www.pathagar.com

কবি দু'টি ভাষায় নির্মাণ করেন। একটি বাঙালা ও অপরটি হিন্দী। ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩ সালে এ-ছবির হিন্দী চিত্রায়ণ মুক্তি পায় 'নিউ সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে'। কবি নজরুল ইসলাম ছবিটির সংলাপসহ গান রচনা, সুর-সংযোজনা ও সংগীত-পরিচালনাও করেন। তিনি এ-ছবিতে মোট তেরটি হিন্দী গান রচনা ক'রে সেগুলোর সংযোজন ঘটান। প্রথম চরণ মিলিয়ে দেখা গিয়েছে—এগুলো পূর্বে কথিত ২৬টি হিন্দী গানের অতিরিক্ত। গানগুলোর প্রথম চরণ নিম্নরূপ—

১. চৌরঙ্গী হ্যায় ইয়ে চৌরঙ্গী।
২. ইয়ে কিস্‌কা তাসান্দুর হ্যায়।
৩. ঝুম্‌ ঝুম্‌ মান মাতওয়ালা।
৪. আগৌরী নিন্দিয়া তু আ-কিউ না জা।
৫. ক্যায়সা খিলান যাবে শাওন মে কাজরিয়া।
৬. সারা দিন ছাত পিটি।
৭. মাত হ' দুখাই রে।
৮. এক লাফাজ মোহাব্বত কা।
৯. আদ্‌না ইয়ে ফাসানা হায়
জো আপনে গুজরাতি হ্যায়।
১০. হাম ইস্‌ককে মারো কা।
১১. ইত্‌নেহি ফাসানা হ্যায়।
১২. কোলি উমেদ বার নেহি আতি।
১৩. আও আও মেরী বিজরী কে বানানেওয়ালে।"[৩৪]

এ-সব গান এখন দুষ্প্রাপ্য। আবদুল আজিজ আল্‌-আমান-সংকলিত 'অখণ্ড নজরুল-গীতি'তেও এগুলোর সব নেই। উপরে উদ্ধৃত প্রথম ও ষষ্ঠ গানটির বাঙালা রূপ 'অখণ্ড নজরুল-গীতি'তে বর্তমান। গানগুলোর বাঙালা ও হিন্দী পাঠ পাওয়া গেলে কবির বাঙালা থেকে হিন্দী বা হিন্দী থেকে বাঙালা অনুবাদের আরও নমুনা দেওয়া যেত।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক, কবির পূর্বোক্ত মোট, ৩৯টি হিন্দী গানের বাইরে আরও অনেক অপ্রকাশিত হিন্দী গানের খোঁজ পাওয়া গেছে। তার সংখ্যা তিন শ'য়েরও অধিক।

যাহোক, পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদকর্ম অসাধারণ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি আরবী, ফারছী, সংস্কৃত, ইংরেজী, পশতু, বাঙালা ইত্যাদি যে-কোন ভাষা থেকে যে-কোন ভাষাতেই অনুবাদ করুন না কেন, তা কেবল ভাষাগত দিক থেকে বিচিত্র নয়; প্রকাশ-ভঙ্গির দিক থেকেও বাহারী। কবির অনুবাদ—ভাষা বা শব্দ-ব্যবহারগত দিক থেকে যেমন ব্যতিক্রমী এবং আলোকময়; ভাব-প্রকাশের অন্তর্গূঢ় আনন্দ ও মৌলিকতায়ও তেমনি অনন্য। বাঙালা কাব্যের অনুবাদ-সাহিত্য ধারায় তাঁর তুলনা—দ্বিতীয় রহিত।

এবার কবির অনুবাদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত ও মূল্যায়নের উল্লেখ করা যেতে পারে।

কাজীর অনুবাদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত

উল্লেখযোগ্য যে, 'কাব্য আমপারা' প্রকাশকালে কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদ-ক্ষমতার যাচাই যেভাবে হ'য়েছে—সেভাবে আজ পর্যন্ত কোন সাহিত্যের কোন কবির—দক্ষতা যাচাই হ'য়েছে কি না সন্দেহ। তা সত্ত্বেও আজও অনেকে নজরুল ইসলামের বিভিন্ন ভাষায় ও সাহিত্যে, জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পর্কে সন্দিহান থাকায় তাঁরা তাঁর অনুবাদ রচনাসমূহ সম্পর্কে সর্বত্র সুবিচার করেননি। নজীর হিসেবে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর উল্লেখ করা যায়। তিনি "নজরুল ইসলামের অনুবাদ-চর্চা" প্রসঙ্গে ব'লতে গিয়ে কবির বিদ্যাবত্তা তথা আরবী-ফারছী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য ক'রে লিখেছেন—"আরব ভূমির সঙ্গে কাজী সাহেবের

www.pathagar.com

যেটুকু পরিচয়, সেটুকু প্রধানতঃ ইরানের মারফতেই। কুরান শরীফের হারানো 'ইউসুফে'র যে করুণ কাহিনী বহু মুছলিম-অমুছলিমের চোখে জল টেনে এনেছে, তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হ'য়েছেন ফারছী কাব্যের মারফতে"।[৩৫] সৈয়দ মুজতবা আলীর এ-উক্তি থেকে মনে হয়, তিনি ব'লতে চেয়েছেন যে, কবি নজরুল ইসলাম আরবী জানতেন না; আর "ফারছী তিনি বহু মোল্লা-মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন।"[৩৬] ইত্যাদি। তাঁর এ ধারণা কত ভুল, তা ইতোপূর্বে যে-আলোচনা করা হ'য়েছে—তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

সৈয়দ মুজতবা আলী আরও লিখেছেন—"নজরুল, কোরআনের শেষ অনুচ্ছেদ 'আমপারা' বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেন—হালে সেটি প্রকাশিত হ'য়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবী জ্ঞান ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে তাঁর কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টি এবং 'আমপারা'র-সঙ্গে তাঁর আবাল্য পরিচয়।"[৩৭] সমালোচকের এ-বক্তব্য যে কত আন্তঃসারশূন্য তা' 'আমপারা'-প্রকাশের পূর্ব বর্ণিত ইতিহাসে বিধৃত হ'য়ে আছে। সেকালের কলিকাতা ইছলামিয়া কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ এবং আলীয়া মাদ্‌রাছার প্রধান মোদাররেছ মওলানা মোমতাজ উদ্দীন ফখরুল মোহাদ্দেছীনদের মত আরবী-ফারছী-উরদু প্রভৃতি ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির অকুণ্ঠ সমর্থন যিনি পেয়েছেন,তাঁর জন্য সৈয়দ মুজতবা আলীর সার্টিফিকেটের নিশ্চয়-ই কোন প্রয়োজন নেই। অধিকন্তু সৈয়দ মুজতবা আলী যখন বলেন—"মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়'-এর অনুকরণে 'শাতিল আরব, শাতিল আরব' ঐ কবিতার-ই অনুবাদ।" তখন পাঠকদের বিস্ময়ে হতবাক হ'তে হয় যে, কী তাচ্ছিল্যের মনোভাব নিয়ে লিখলেই না এমন উক্তি করা যায় এবং 'শাতিল আরব'-এর মত একটি মৌলিক রচনাকে অন্য একটি বাংলা কবিতার ছাঁচে ঢালা অনুবাদ বলা যায়। অথচ অন্যত্র এই মুজতবা আলী-ই নজরুল কৃত অনুবাদের প্রশংসা ক'রতে গিয়ে ব'লেছেন—কাজীর অনুবাদ, সকল অনুবাদের কাজী।"

www.pathagar.com

অতঃপর ড. সুশীলকুমার গুপ্তের কতিপয় কোট্ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

ড. সুশীল কুমার গুপ্ত নজরুলের অনুবাদের সামগ্রিক সফলতা সম্পর্কে লিখেছেন—"নজরুল তাঁর অধিকাংশ অনুবাদ বিশেষ ক'রে হাফিজের গজল ও রুবাইয়ের অনুবাদেই মূল কাব্যের ভাব ও গতি বজায় রাখতে এবং সেই সঙ্গে তাঁর সৌন্দর্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি ক'রতে সমর্থ হ'য়েছেন।"[৩৮]

এরপর নজরুল ইসলামের অনুবাদ গ্রন্থগুলোর আলোচনা-প্রসঙ্গে ড. গুপ্তের অভিমত কবি হাফিজের রচনার অনুবাদে—"চলতি খাঁটি বাঙ্লা ও গ্রাম্য বাঙ্লা শব্দ নজরুল অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার ক'রে তাঁর অনুবাদকে সহজ ও সাবলীল ক'রে তুলতে পেরেছেন।"[৩৯] উল্লেখ্য, এ নৈপুণ্যের অভাবে বুদ্ধদেব বসুর অনূদিত 'মেঘদূত', গুরু-চণ্ডালী ভাষা-ব্যবহারের দোষে অভিযুক্ত হ'য়েছে।

ড. গুপ্ত, কবির আরবী-অনুবাদ সম্পর্কে লিখেছেন—"ছুরা 'ফাতেহা'র অনুবাদে 'নজরুল অসামান্য সাফল্য অর্জন ক'রেছেন। সঠিক অনুবাদ হ'য়েও এটিতে কোন আড়ষ্টতা নেই।.....(তিনি) 'বিস্মিল্লাহির রাহমানের রাহিম'-এর যে নানা অনুবাদ ক'রেছেন, তাতে তাঁর অনুবাদ ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে। মূলভাব থেকে বিন্দু মাত্র ভ্রষ্ট না হ'য়েও অনুবাদগুলি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হ'তে পেরেছে।"[৪০]

ড. গুপ্ত নজরুলকৃত ওমর খৈয়ামের রুবাইয়ের অনুবাদে ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা সম্পর্কে পুনরায় ব'লেছেন—"নজরুল তাঁর অনুবাদে আরবী, ফারছী, সংস্কৃত, বাংলা, গ্রাম্য ইত্যাদি শব্দ নির্বিচারে ব্যবহার ক'রেছেন। অপরিচিত ও অনতিপরিচিত আরবী-ফারছী শব্দ যে,কী আশ্চর্য দক্ষতায় তৎকর্তৃক বাঙ্লায় ব্যবহৃত হ'য়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ-ই যথেষ্ট। এই সব শব্দের জায়গায় সংস্কৃত বা বাঙ্লা শব্দ বসালে এমন ব্যঞ্জনা ফুটত না।"[৪১]

www.pathagar.com

ড. গুপ্ত অতঃপর লিখেছেন—" অনুবাদের মধ্যে অনেক জায়গায় যে সব চিত্রকল্প পাওয়া যায়, তাদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে ও তাদের আস্বাদন ক'রতে ভাষান্তরে বিন্দু মাত্র বাধা সৃষ্টি হয়নি।[৪২] এরও তিনি পাঁচটি উদাহরণ দিয়েছেন।

তারপর লিখেছেন—"এই অনুবাদ গ্রন্থের (অর্থাৎ রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম-এর) অনেক জায়গায় ওমরের ব্যঙ্গ করার আশ্চর্য শক্তির স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে। কিন্তু.....১৮৩ নম্বর রুবাইয়ে তাঁর এই শক্তি যেভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে তার তুলনা মেলা ভার।"[৪৩]

কিন্তু এতসব প্রশংসা-বাচনের পরও ড. গুপ্ত পুনরায় সামগ্রিকভাবে নজরুল কৃত অনুবাদ সম্পর্কে মূল্যায়ন ক'রতে লিখেছেন—"সমগ্রভাবে বিচার ক'রলে বলা যায় যে, হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদের তুলনায় ওমরের রুবাইয়াতের অনুবাদে নজরুলের সাফল্য সীমিত।.....কোন কোন জায়গায় ছন্দ, শব্দ-চয়ন ও বাক্য বিন্যাসে নজরুলের অযত্ন, ঔদাসীন্য ও শিথিলতা প্রকাশিত হ'য়েছে।"[৪৪]

এ-বক্তব্য যে, ড. গুপ্তের-ই নিজস্ব বিশ্লেষণের বিরোধী, তা স্পষ্ট। তিনি নিজেই হাফিজ অপেক্ষা ওমরের রুবাইয়াৎ-এর অনুবাদের—ভাব, ভাষা, শব্দচয়ন, চিত্রকল্প, রঙ্গব্যঙ্গ ইত্যাদির প্রশংসা ক'রেছেন অকুণ্ঠভাবে। তথাপি, আলোচনার শেষে নজরুলকে নিন্দা করা থেকে বহু সমালোচকের মত ড. সুশীলকুমার গুপ্তও বিরত থাকতে পারেননি। নজরুলের কিছু প্রশংসা, যেন ওই নিন্দায় পৌছাবার সিঁড়ি মাত্র।

ভারতীয় বাঙালার এক শ্রেণীর সমালোচকের এ-মনোভাব ও প্রবণতা বাঙলাদেশেও কোন কোন কৃতবিদ্য নজরুল-গবেষকের রচনায় লক্ষ্য করা যায়।"[৪৫]

অতঃপর বাঙলাদেশের প্রখ্যাত ছান্দসিক কবি ও ছন্দ-তত্ত্ববিদ্ সাহিত্য সমালোচক মরহুম আব্দুল কাদির, নজরুলকৃত অনুবাদের ছন্দগত

www.pathagar.com

সৌকর্য ও সাফল্য সম্পর্কে যা ব'লেছেন, তার উল্লেখ করা চলে।

তিনি 'দিউয়ান-ই হাফিজ'-এর অনুবাদে নজরুল ইসলামের ছন্দগত দক্ষতা সম্পর্কে লিখেছেন—"এ-সকল অনুবাদে নজরুল মূলের ভাব ও ছন্দঃধ্বনি যথাসম্ভব বজায় রেখেছেন" অতঃপর তিনি দু'ছত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন—"উপরোদ্ধৃত চরণদ্বয়ে প্রস্ববের (Accent-এর) এরূপ পর্যায়-বিন্যাসের দরুণ তাঁর ছন্দে ফারছীর লঘু-গুরু ধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি সম্ভব হ'য়েছে। নজরুলের সূক্ষ্ম ছন্দঃশ্রুতি তাঁর অনূদিত গজলেও এনে দিয়েছে মধুর গীতি ঝঙ্কার। নজরুল যেখানে ছন্দকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন ভাবের কল্পলোকে, সেখানে বাণীর আবেদন হ'য়েছে অধিকতর তীক্ষ্ণ ও প্রাণময়।"[৪৬]

এরকম অবস্থায় কবির অনুবাদ যদি কোথাও কোথাও উকর্ষহারা হ'য়েছে থাকে, তাহ'লে সেই ত্রুটিকেই বড় ক'রে দেখা নিশ্চয় 'হিংসাতুর' পরশ্রীকাতরের কাজ—রস ও গুণগ্রাহীর কাজ নয়।

সামগ্রিকভাবে তাই বলা যায়, নজরুল ইসলামের সমস্ত অনুবাদ সামগ্রিক বিবেচনায়—মূলানুগত্যে, ভাব, ভাষা, ছন্দ, রস ও বাগ্‌ভঙ্গীতে অনবদ্য। তা মূলভাষার ভাব-সৌন্দর্য ও রস-লাবণ্যকেও অনুবাদে সঞ্চার ক'রতে সমর্থ হ'য়েছে। যদি নজরুলকৃত অনুবাদের প্রতিটি চরণে নাও হয়, তথাপি শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে যে, এ-সাফল্য লক্ষণীয়—তা কেউ অস্বীকার ক'রতে পারবে না। এ-কারণে সৈয়দ মুজতবা আলীর বিদ্বিষ্ট মূল্যায়নের কথা ভুলে গিয়ে আমরা তাঁর প্রসন্ন মূল্যায়নের সঙ্গে এক মত হ'য়ে ব'লতে পারি—বাঙালা সাহিত্যে, "কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী।"

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

১. মাহফুজুর রহমান খান। নজরুলের কাব্য-আমপারার অন্তরালে, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, গ্রীষ্ম ১৩৮৩। পৃষ্ঠা-৮০-৯২।
২. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল চরিত-মানস, (কলি. ১৯৯০), পৃষ্ঠা-৩৩৭।
৩. কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, (ঢাকা-১৩৭০), পৃষ্ঠা-৯৯-১০০।
৪. সুশীল কুমার গুপ্ত। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২৫।
৫. কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৯১।
৬. ঐ, পৃষ্ঠা-২৯১।
৭. ঐ, পৃষ্ঠা-২৮১-'৯২।
৮. আবদুল কাদির। নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, (ঢাকা-১৯৮৯), পৃষ্ঠা-২২১।
৯. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২৮।
১০. কাজী নজরুল ইসলাম। ন. র., ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৮৫।
১১. এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য এস. এম. লুৎফর রহমান। সঙ্গীতবিদ্ কবি নজরুল ইসলামের 'সুর ও শ্রুতি', দশকব্যাপী নজরুল-জন্মশতবর্ষ বক্তৃতামালা-১২, নজরুল ইনস্টিটিউট, (ঢাকা-আগস্ট-১৯৯২), পৃষ্ঠা-১-৪৮।
১২. আবদুল আজিজ আল্ আমান-প্রকাশিত অপ্রকাশিত নজরুল, (কলিকাতা-১৯৮৯), পৃষ্ঠা-সতের।
১৩. দেখুন—হিন্দী ভাষায় রূপান্তরিত এ-গানের বাঙালা অক্ষরে লিখিত হস্তলিপি। আল্ আমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২৮।
১৪. দ্রষ্টব্য, আবদুল মান্নান সৈয়দ। নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা, (ঢাকা-১৯৭৭), পৃষ্ঠা-৯০-১১৬।
১৫. দ্রষ্টব্য, মুজফ্ফর আহমদ। কাজী নজরুল প্রসঙ্গে, (কলিকাতা-১৯৫৯), পৃষ্ঠা-৪৯।
১৬. দ্রষ্টব্য, কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, (ঢাকা-১৯৬৬), পৃষ্ঠা-৭১৪-৭১৮।
১৭. দেখুন—এস.এম. লুৎফর রহমান। ধূমকেতু ও তার সারথি, (ঢাকা-২০০৫), পূর্বোক্ত পৃ. ৩০৩।
১৮. সৈয়দ আলী আহ্সান। নজরুল ইসলাম, (ঢাকা, ১৩৬১), পৃ. ২০;-২১।
১৯. ঐ, পৃ. ২১।
২০. ঐ, পৃ. ২১-২২।
২১. ঐ, পৃ. ২২।
২২. ঐ, পৃ. ২২।
২৩. ঐ, পৃ. ২৩।
২৪. ঐ, পৃ. ২৩-২৪।

www.pathagar.com

২৫. ঐ, পৃ. ২৪-২৫।
২৬. ঐ, পৃ. ১৯।
২৭. আব্দুল আজিজ আল্-আমান-সম্পাদিত। অপ্রকাশিত নজরুল, পূর্বোক্ত, পৃ. সতের।
২৮. ঐ, পৃ. ৩২৩।
২৯. আবদুল আজিজ আল্-আমান-সম্পাদিত। নজরুল-গীতি (অখণ্ড), (কলি-১৯৯৩), পৃ. ৫১৩।
৩০. ঐ, পৃ. ৫১১।
৩১. আবদুল আজিজ আল্-আমান। অপ্রকাশিত নজরুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩।
৩২. ঐ, পৃ. ৩৩৬।
৩৩. ঐ, পৃ. সতের।
৩৪. শেখ দরবার আলম। অজানা নজরুল (ঢাকা-১৯৮৮), পৃ. ৫২৬।
৩৫. সৈয়দ মুজতবা আলী। বিশ্বনাথ দে-সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২০২।
৩৬. ঐ, পৃ.-২০২।
৩৭. ঐ, পৃ. ২০২।
৩৮. ঐ, পৃ. ২০৩।
৩৯. সুশীর কুমার গুপ্ত। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২২।
৪০. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৩১।
৪১. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৩৭।
৪২. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪৬।
৪৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪৭।
৪৪. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪৭-'৪৮।
৪৫. ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪৮।
৪৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪৮-'৪৯।
৪৭. দ্রষ্টব্য, আবদুল মান্নান সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৩।
৪৮. আবদুল কাদির। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১৬।

www.pathagar.com

নজরুল-প্রবন্ধে নজরুল

ডক্টর মো. শহীদুর রহমান*

নজরুল ও তাঁর প্রতিভাকে অনেকেই বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষণের বিচিত্র ধারা আমরা দেখেছি। তারপরেও মনে হয় নজরুল আচ্ছাদিত বারান্দায় র'য়ে গেছেন। এ-আচ্ছাদন আমাদের সীমাবদ্ধতার, না সংকীর্ণতার সেটাই ভাববার বিষয়। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আমরা যার যার মত নজরুলকে ব্যবহার ক'রছি মাত্র। অথচ নজরুল তাঁর প্রতিভার বিশ্লেষণ নিজেই দিয়ে গেছেন তাঁর প্রবন্ধগুলোতে।

প্রবন্ধসমূহে নজরুলকে একজন অভাবিতপূর্ব দায়বদ্ধ মানুষ ব'লে মনে হয়। তাঁর এ দায়বদ্ধতা দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, এমনকি মানুষের প্রতি। এ-পৃথিবীতে মানব-সৃষ্টির একটি নিগূঢ় তত্ত্ব-রহস্য-উদ্দেশ্য আছে। নজরুল মনে করেন মানুষের দায়বদ্ধতা সেই তত্ত্ব-রহস্য-উদ্দেশ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এ-সম্পর্ক নজরুলের প্রবন্ধগুলো থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে নিম্নোক্ত রূপে বিশ্লেষণ করা যায়।

১. "তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতই ভাস্বর, আর একই মহাত্মার অংশ।"[১]

২. "এই বিদ্বেষ-কলহ-কলংকিত, প্রেমহীন, ক্ষমাহীন অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে, শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে আল্লার বান্দা রূপেই কর্মক্ষেত্র অবতীর্ণ হ'য়েছি"।[২]

৩. "একথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য আছে, ভগবান আছে, চিরকাল ধ'রে আছে এবং চিরকাল ধ'রে থাকবে। যে আজ সত্যের বাণী রুদ্ধ ক'রছে, সত্যের বাণীকে মূক ক'রতে চাচ্ছে, সেও তার-ই

* প্রফেসর ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

www.pathagar.com

এক ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র সৃষ্টি অণু। তার-ই ইঙ্গিতে-আভাসে ইচ্ছায় সে আছে, কাল হয়তো থাকবে না। নির্বোধ মানুষের অহঙ্কারের আর অন্ত নাই; সে যার সৃষ্টি তাকেই সে বন্দী ক'রতে চায়, শাস্তি দিতে চায়।"[৩]

৪. "অসুন্দরের সাধনা আমার নয়, আমার আল্লাহ্ পরম সুন্দর।"[৪]

৫. "সুর আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে, সেই অসুরের জন্য।"[৫]

৬. 'সত্য মাত্রই সুন্দর, সত্য চির মঙ্গলময়।'[৬]

৭. "সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীট্‌সের মত আমারও মন্ত্র—"Beauty is truth , truth beauty."[৭]

৮. "আমি সত্য-রক্ষার, ন্যায়-উদ্ধারের বিশ্বপ্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাঙলার শ্যাম শ্মশানের মায়া-নিদ্রিত ভূমে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে।"[৮]

৯. "আমাদের পরম প্রভুর ধ্যান করা মানে সময় নষ্ট করা নয়, আমাদের-ই না-জানা পূর্ণতাকে স্বীকার করা..... ।"[৯]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের প্রথমটিতে মানবাত্মাকে মহাত্মার অংশ বলা হ'য়েছে। দ্বিতীয়টিতে অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর, শান্তিপূর্ণ করার মানসে কবি আল্লাহ্‌র বান্দা রূপেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে মানুষকে সত্যের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৃষ্ট অণুরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। ৪র্থ উদ্ধৃতিতে স্রষ্টাকে পরম সুন্দর বলে উপলব্ধি করা হয়েছে। ৫ম উদ্ধৃতিতে সুন্দরের প্রতিপক্ষ হিসেবে সুন্দরের অবমাননাকারী অসুরকে ভাবা হয়েছে। ৬ষ্ঠ উদ্ধৃতিতে সত্য মাত্রই সুন্দর চিরমঙ্গলময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ৭ম উদ্ধৃতিতে যা সুন্দর তাই সত্য বলে শাশ্বত একটি বাণী উল্লেখিত হয়েছে। ৮ম উদ্ধৃতিতে কবি সত্য রক্ষার এবং উদ্ধারের জন্য স্রষ্টা কর্তৃক লাল সৈনিক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। ৯ম উদ্ধৃতিতে সেই পরম সুন্দর প্রভুর ধ্যান করার অর্থ সময় নষ্ট করা নয় বরং মানুষের পূর্ণতা এবং অস্তিত্বকে অনুধাবন করা হয়েছে। এ

www.pathagar.com

থেকে উপলব্ধ হয় সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ-সম্পর্কে ভাবা যায়, সৃষ্টি-জগতের অস্তিত্ব সেই মহান স্রষ্টায় নিহিত। অতএব মানুষের জন্মগত দায়-দায়িত্বই হলো পৃথিবীতে সত্য-সুন্দর-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা। এজন্যই কবি নজরুল ইসলাম বলেন জন্মগত দায়-দায়িত্বই হলো পৃথিবীতে সত্য-সুন্দর-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা। এ জন্যই কবি নজরুল ইসলাম বলেন "আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে, অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম— অসুন্দরকে ক্ষমা করতে অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম। আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর।"[১০]

এ থেকে উপলব্ধি জন্মে যে, মানুষ জন্মগতভাবে সত্য-সুন্দর-শান্তি ও ন্যায়-প্রতিষ্ঠার জন্য দায়বদ্ধ। কিন্তু যে-মানুষ এই দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার করে না কিংবা একাজে যারা বিকল্প খোঁজে মূলতঃ তারাই অকৃতজ্ঞ। আর এ-অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন মানুষের মানবীয় কর্ম-কাণ্ডের মধ্যে পড়ে না।

নজরুল তাঁর প্রবন্ধগুলোতে সমাজকে কল্যাণময় করার জন্য একটি সূক্ষ্ম দর্শনভিত্তিক পরিকল্পনা দিয়ে গেছেন। এ-দর্শনালোকে মানুষের মঙ্গল বা মর্যাদা সংরক্ষণ কি ভাবে হবে, তা তাঁর প্রবন্ধ থেকেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেন:

১. "কওমের সত্যিকার কল্যাণ করতে হলে ত্যাগ করতে হবে হজরত ইব্রাহিমের মত।"[১১]

২. "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। প্রকাণ্ড তাঁর সৃষ্টি। সে সৃষ্টির পশ্চাৎভূমিতেই জন্ম নিয়েছে চন্দ্র-সূর্য-তারকা, সৃষ্টির ঐশ্বর্য। এই বৃহৎকে বুঝবার সাধনাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।"[১২]

৩. "আল্লাহে পূর্ণ আত্মসর্ম্পণ যার হয়েছে তিনি এই দুনিয়াকে এই মুহূর্তে ফেরদৌসে পরিণত করতে পারেন।"[১৩]

www.pathagar.com

৪. "অন্তরে আল্লার করুণার এক কণাও যে পেয়েছে, তার কখনো বীভৎস লোভী মূর্তি দেখা যায় না। সে কখনো বাইরের যশ-খ্যাতি-ঐশ্বর্যের মোহে জোঁকের মত কওমকে, জাতিকে রক্ত-শুষে মেরে ফেলে না।"[১৪]

৫. "আমার মধ্যে যতক্ষণ আবরণ অর্থাৎ ভেদাভেদ জ্ঞান, সংস্কার, কোন প্রকার বাধা-বন্ধন আছে, ততক্ষণ আমার মাঝে কুফর আছে। আমি সর্ববন্ধন মুক্ত, সংস্কারমুক্ত, সর্ব ভেদাভেদ জ্ঞান মুক্ত না হলে—সেই পরম নিরাবরণ পরম মুক্ত আল্লাহকে পাব না আমার শক্তিতে।"[১৫]

৬. "আল্লাহর উর্ধ্বের জালাল-শক্তিকে স্পর্শ করতে হবে তাঁদের, যাঁরা দেশকে, জনগণকে পরিচালনা করতে চান।"[১৬]

৭. "যে-দৃষ্টি আপাত-মধুর লাভের লোভে তলোয়ারকে করে ঝিঙে চাঁচার বঁটি, মাটি খোঁড়ার খোন্তা, সে দূরদর্শী স্রষ্টা নয়। অন্যের মাল পয়মাল করে নিজে ধনী হওয়ার সুপ্ত লোভ তার অন্তরে জটিল সাপের মত ফণা গুটিয়ে আছে। তার মাথায় মণি থাকলেও সে বিষধর ফণী।"[১৭]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলো পর্যালোচনা করলে অনুভূত হয়, জগৎ-সংসারের যাবতীয় কল্যাণ, বিশ্বাসের নিগূঢ়তত্ত্ব নির্ভরতা মহা কল্যাণময় সৃষ্টিকর্তার অপার সৌন্দর্যের অস্তিত্বের সঙ্গে অন্বিত। মহান স্রষ্টার সেই সৌন্দর্য পরিদৃশ্যমান জগতের সমাজ-শৃঙ্খলায়, সাম্যে, মহত্বে, বৃহতে, ক্ষমায়, ত্যাগে, করুণায়, ঐক্যে, জ্ঞানে, বিবেকে. সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠায়, মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে, সমাজ-দেশ-মানব প্রেম, আইনের শাসনে, উন্নয়নে তথা যাবতীয় সুকুমার বৃত্তির বিকাশে। অতএব বলা যায়, জগতে অসত্য-অন্যায় উৎখাত করে, সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহান স্রষ্টার স্বরূপ উপলব্ধি করাই হলো নজরুলের কল্যাণময় দর্শনের মূল কথা। মনে হয় গোটা বিশ্বের মূল শেকড় এই কল্যাণময় দর্শনের

www.pathagar.com

ভিত্তিভূমিতে সুদৃঢ়। এজন্যই নজরুল অগাধ বিশ্বাসে বলেন:

> "আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোট গল্প হয়ে,তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। "ধূমকেতু" "লাঙ্গল"; "গণবাণীতে"। তারপর এই "নবযুগে"তাঁর শক্তি-সুন্দর প্রকাশ এসেছিল; আর তা এল রুদ্র তেজে, বিপ্লবের, বিদ্রোহের বাণী হয়ে,তখনো এ-কথা ভাবতে পারিনি, এলেখা আমার নয়, এলেখা আমারি সুন্দরের, আমারি আত্মা-বিজড়িত পরমাত্মীয়ের। **** আমি আমার প্রলয় সুন্দরকে প্রাণপণে ডাকতে লাগলাম "পথ দেখাও, তোমার পথ দেখাও।" কে যেন স্বপ্নে এসে বলল, কোরান পড়, ওতে যা লেখা আছে, তা পড়লে তোমার প্রলয়-সুন্দরকে— আমারও উর্ধ্বে তোমার পূর্ণতাকে দেখতে পাবে। আমি নমস্কার করে বললাম, "তুমিই কি আমার কবিতায়, লেখায় বিদ্রোহ হয়ে, বিপ্লবী বাণী হয়ে—আমার কল্পনায়, আমার চেতনায় প্রকাশিত হয়েছিলে? তিনি আমায় বললেন—"হ্যাঁ, আমি তোমার-ই পূর্বচেতনা প্রিকনস্যাসনেস।"[১৮]

নজরুল এই সুন্দরকে পান "প্রিয়ঘন-সুন্দর", "প্রেমঘন-সুন্দর", '"রসঘন-সুন্দর", "আনন্দঘন-সুন্দর", "যৌবন-সুন্দর", "শোক-সুন্দর", "স্নেহ-সুন্দর", "শিশু-সুন্দর", "সংহার-সুন্দর", 'ধ্যান-সুন্দর', "স্বর্ণ-সুন্দর", "জ্যোতি-সুন্দর", "ধরিত্রী-সুন্দর", "মানব-সুন্দর" রূপে। অর্থাৎ সৃষ্টি-জগতের এই সব সুন্দরের সমাহারে নজরুল মহান

www.pathagar.com

স্রষ্টার অস্তিত্বকেও খুঁজে পান। এ-জন্যই তিনি বলেন:

> "তোমার চৈতন্য ফিরে এসেছে, তোমার মাঝেই তোমার স্রষ্টাকে দেখতে পাবে আজ সৃষ্টিতে, পৃথিবীতে, আকাশে, বাতাসে, রস-ভরা ফলে, সুরভিত ফুলে, স্নিগ্ধ মৃত্তিকায়, শীতল জলে, সুখদায়ী সমীরণে, তোমার সৃষ্টি-সুন্দরকে প্রকাশ স্বরূপে দেখেছ। তোমার না-দেখা পরম প্রিয়তম, পরম বন্ধুকে পেতে, বিপুল অসহতৃষ্ণা, স্বপ্ন, সাধ, কল্পনা, বাঁধ না-মানা বেগসহ অসীমের পানে, প্রবল প্রবাহ নিয়ে, উজান গতিতে উর্ধ্বের পানে চলেছিলে, আজ সেই পরম পূর্ণতার, পরম শান্তির, পরম মুক্তির আনন্দবাণী নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি— তোমার বন্ধু হয়ে। এই পৃথিবীতেই তাঁর সঙ্গে তোমার মিলন হবে; সর্ব অসাম্য, ভেদকে দূর করতে হবে। তারপর হবে তোমার সুন্দরের সাথে পরম বিলাস, পরম বিহার।"[১৯]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে এ-কথাই প্রতীয়মান হয় যে, পরিদৃশ্যমান জগতের সকল সুন্দর সৃষ্টি তথা মনুষ্যত্বের বিকাশের মধ্যেই পরম সুন্দর স্রষ্টার অস্তিত্ব বিদ্যমান। পক্ষান্তরে অন্যায়, অসত্য, লোভ, মোহ-দমন, অধিকার-হরণ, শোষণ-পেষণ, জুলুম-নির্যাতন, সন্ত্রাস, তথা অমানবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সেই পরম স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুপস্থিত। অতএব, নজরুলের যে প্রলয়-সুন্দর-শক্তির আরাধনা, তাও ঐ পরম স্রষ্টার মঙ্গলময় শক্তির অন্তর্গত এবং এই শক্তি মানব-সমাজে প্রয়োগের অর্থই হলো মানব-সমাজ থেকে যত রকম অন্যায়-অত্যাচার, অনিয়ম,

www.pathagar.com

সুদ-ঘুষ, সন্ত্রাস-দূর্নীতি উৎখাত করে মানবতার মহান ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠা করা। আর এই মানবতা প্রতিষ্ঠার ঐশ্বর্যের মধ্যেই মহান স্রষ্টার মঙ্গলময় সুন্দররূপ উদ্ভাসিত। অতএব নজরুলের তারুণ্য ও স্বাধীনতার মূলও সেই সুন্দরের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের দর্শনে উজ্জীবত। এমনকি, নজরুলের জীবনে অপরিসীম ত্যাগের মহিমাও এক-ই দর্শনে নিহিত। নজরুলের মানবতা, নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, অপরের দুঃখকে নিজের করে নেয়া, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা, দুঃসাহসী বিদ্রোহ-অভিযান সব কিছুই সেই সৃষ্টিতত্ত্ব বা সৌন্দর্য-দর্শনের আলোকে পরিস্ফুটিত। গোটা পৃথিবী একটি পরম সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সম্পর্কই সমাজে, রাষ্ট্রে কিংবা ব্যক্তি-জীবনে প্রতিফলতি। কি শিল্পী, কি ব্যবসায়ী, কি বিজ্ঞানী, কি বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল কিংবা নেতা-নেত্রী-রাষ্ট্র নায়ক অথবা ধর্মগুরু, শিক্ষাগুরু, সাহিত্যিক তথা সকল স্তরের মানুষ এক-ই শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই বন্ধনকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা কারোরই নেই। অথচ মানুষ অকৃজ্ঞতা বশতঃ তা অস্বীকার করে, উপেক্ষা করে। শুধু উপেক্ষা নয়, মানুষ স্রষ্টার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৃষ্টি—অণু হয়েও এবং স্রষ্টার কৃপায়-ইচ্ছায় থেকেও অহঙ্কারে স্রষ্টাকে ধ্বংস করতে চায়, শাস্তি দিতে চায়। অর্থাৎ এই অহঙ্কার বা অকৃতজ্ঞতাই সংকীর্ণতা অজ্ঞতা বা অন্ধত্ব। আর এই অন্ধত্ব-অজ্ঞতা তথা সংকীর্ণতাকে 'কুফুরী' বলে মনে করেন নজরুল। এজন্যই তিনি প্রকৃত জ্ঞান অর্জন ও আদর্শ শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই আদর্শ শিক্ষাই মানুষকে সাম্যের সঙ্গে, শান্তির সঙ্গে, বৃহতের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে—এমনকি, সত্য-সুন্দরের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়। আর এভাবে মানুষের পরম সত্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। এ-জন্যই নজরুল বলেন:

> "যুগে যুগে আদর্শবাদীরাই জগতকে আনন্দে, শান্তিতে ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাঁহারা বৃহতের চিন্তা করেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে কল্যাণ আনয়ন করেন। ক্ষুদ্রত্বের বন্ধনে বাঁধা থাকিলে জীবন,

www.pathagar.com

> যৌবন ও কর্মের শক্তি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। বৃহৎ কর্মের অধিকারী হইতে হইলে, দেশের মানুষের বৃহৎ কল্যাণ আনিতে হইলে, বৃহৎ শক্তির আধার হইতে হয়। নিত্য পরম ক্ষমাময় আল্লাহ্‌র তৃষ্ণা থাকিলে এই বৃহৎ কর্মের অধিকারী হওয়া যায়। নদী সমুদ্রের তৃষ্ণা নিয়া ছোটে, তাই সমুদ্রকে পায়। সমুদ্রের তৃষ্ণা ছাড়া নদীর অন্য তৃষ্ণা নাই, তবু যাইতে যাইতে তার দুই কূলকে শস্য-শ্যামল, ফুলে ফলে ফুল্ল করিয়া যায়, দুই কূলের লোকের সমস্ত অশুদ্ধিকে নিজের দেহে লইয়া, তাহার দুই কুলের আবহাওয়াকে শুদ্ধ রাখে।"[২০]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যাঁরা শিক্ষার মাধ্যমে এই বৃহতের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে পারেন, তারাই প্রকৃত শিক্ষিত, জ্ঞানী এবং তাদের দ্বারাই জগতের কল্যাণ আনয়ন সম্ভব । পক্ষান্তরে, যাঁরা শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সেই বৃহৎ কল্যাণময়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চান না—তারাই আত্ম-স্বার্থপরতায় পৃথিবীর বায়ু দূষণের মাধ্যমে মানুষে মানুষে বৈষম্যের দেয়াল সুদৃঢ় করেন।

নজরুলের প্রবন্ধপাঠে আরো উপলব্ধি জন্মে যে, তিনি অত্যন্ত বড় হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। এ-কারণেই মানুষের জন্য যা মঙ্গলময় তা গ্রহণ এবং যা অমঙ্গলকর তা বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। এখানেই নজরুলকে কুসংস্কার-মুক্ত মনে স্রষ্টা ও মানুষের নির্ভেজাল সম্পর্ক স্থাপনের সাধক ব'লে ভাবা যায়। এ-সম্পর্কের কারণেই মানুষে মানুষে কোনো ভেদজ্ঞান তাঁর ছিল না। তিনি বলেন:

"মানুষ হইয়া মানুষকে কুকুর-বিড়ালের মত এত ঘৃণা করা মনুষ্যত্ব ও আত্মার অবমাননা নয় কি? আত্মাকে ঘৃণা করা আর পরমাত্মাকে ঘৃণা করা এক-ই কথা।"[২১]

তাহ'লে উপলব্ধ হয়, পৃথিবীতে অকল্যাণ বয়ে আনার জন্য এ-ধারায়

www.pathagar.com

মানুষের আগমন ঘটেনি। বিশেষ করে কবি-সাহিত্যিকদের আগমন ঘ'টেছে তো পঙ্কিলতা-মুক্ত পৃথিবী গড়ার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে। আর সেই মানুষ বা কবি-সাহিত্যিকদের হৃদয় যদি সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ-অসুন্দর ও অনুদার হয়—তবে তাদের সৃষ্ট সাহিত্য তো ক্ষণস্থায়ী হবেই। উপরন্তু মানুষের পৃথিবী হবে বাসের অযোগ্য। এ জন্যই বিশেষ করে কবি-সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে নজরুল বলেন:

> "লেখকের লেখা হইতেছে তাঁহার প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি। যেখানে লেখক সত্য, তাঁহার লেখাতেও সে-সত্য স্পষ্ট ভাবেই ফুটিয়া উঠিবে; যেখানে লেখক মিথ্যা,. সেখানে সেই মিথ্যাকে তিনি হাজার চেষ্টা করিলেও লুকাইতে পারিবেন না।,..... সাহিতিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মত উন্মুক্ত উদার, তাহাতে কোন ধর্ম-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ, বড়-ছোট জ্ঞান থাকিবে না। বাঁধ দেওয়া ডোবার জলের মত যদি সাহিত্যিকের জীবন পঙ্কিল, সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার সাহিত্য-সাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হইবে। তঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আতুর ঘরেই মারা যাইবে। যাঁহার প্রাণ যত উদার, যত উন্মুক্ত, তিনি তত বড় সাহিত্যিক।"[২২]

আর সাহিত্যিকের এই উদারতা যদি তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে জাতির হৃদয়ে প্রবেশ করে, তবে সে জাতি একদিকে যেমন হবে উন্নত-সমৃদ্ধ, অপরদিকে হবে স্রষ্টা তথা সৃষ্টি-রহস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এজন্যই নজরুল আর্ট ও আর্টিস্ট সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেন:

> "তিনি-ই আর্টিস্ট যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth) এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চির-মঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি বা মানুষ এবং প্রকৃতি (Man plus

www.pathagar.com

nature) ইত্যাদি বলা যাইতে পারে, তবে সত্যের প্রকাশ-ই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।"[২৩]

মানুষের উৎস এক ও অভিন্ন তত্ত্বে যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে সমাজে মানুষ হিসেবে মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকার মানুষের জন্মগত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কোনো কোনো মানুষ ও তত্ত্ব মোটেও স্বীকার করে না। 'জোর যার মুল্লুক তার'-নীতিতে তারা বিশ্বাসী। এভাবেই নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষে মানুষে বৈষম্যের উৎপত্তি বলে—নজরুলের প্রবন্ধ পাঠে অনুভব করা যায়। অথচ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো পৃথিবীতে সত্য-সুন্দর-শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। যদি কোনো মানুষ তার এই দায়বদ্ধতা স্বীকার না করে, তবে তার দ্বারাই এই পৃথিবী কলঙ্কিত ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এ জন্যই যুগে যুগে পৃথিবীতে সর্বত্যাগী মহামানবগণের আগমন ঘটেছে। তারা মানুষের মঙ্গল করতে যেয়ে যে-ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সে সম্পর্কে নজরুল বলেন, "বড় ত্যাগ তাঁর জন্য, যিনি সকলকে বড় করবেন।"[২৪]

আর এই বড় ত্যাগ তিনি-ই করতে পারেন, যিনি স্রষ্টার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়তে পেরেছেন। অনেকে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার প্রসঙ্গে ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় করতে যাওয়ার সাধনাকে সময় নষ্ট করা ভাবেন। নজরুল বলেন :

> "আমাদের পরম প্রভুর ধ্যান করা মানে সময় নষ্ট করা নয়, আমাদের-ই না জানা পূর্ণতাকেই স্বীকার করা। আমারি ঘুমন্ত অফুরন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। নির্লোভ, নিরহঙ্কার, দ্বন্দ্বাতীত হলে,—লোভ, অহঙ্কার ও দ্বন্দ্বের মাঝে নেমে অবিচলিত শান্তচিত্তে কর্ম করা যায়। প্রশংসা, জয়ধ্বনি, অভিনন্দন তখন কর্মীকে ফানুসের মত ফাঁপিয়ে তোলে না। নিন্দা, হিংসা, অপমান, পরাজয়

www.pathagar.com

> তখন কর্মীকে নিরাশ করতে পারে না। তাঁর অটল ধৈর্য ও বিশ্বাসকে টলাতে পারে না। মন্দ-ভালো দুয়ের মধ্যেই ইনি পূর্ণ অভয়চিত্তে বিচরণ করতে পারেন। তছবী অর্থাৎ জপমালা ও তরবারি দুই-ই তখন তার কাছে সমান হয়ে ওঠে।"[২৫]

এ জন্যই নজরুল তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় কর্ম ও ধর্মের সমন্বয় সাধন ক'রতে যেয়ে বলেন:

> "জনগণকে তাই বলে ধর্মের আশ্রয়চ্যুত করবার অধিকার কারুর নেই। এ-অধিকারচ্যুত করতে চাইবেন যিনি, তিনি, মানবের নিত্য কল্যাণের, শান্তির শত্রু। ধর্ম ও কর্মের যোগসূত্রে যদি মানুষ বাঁধা না পড়ে তাহ'লে মানুষকে এমনি চিরদিন কাঁদতে হবে।"[২৬]

অর্থাৎ নজরুল সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভোগবাদী দর্শন ও ত্যাগবাদী দর্শনের ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্যালোচনার মাধ্যমে গ্রহণ-বর্জন নীতিটি সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করেছেন। এভাবেই সৃষ্টি-তত্ত্বের 'চেক এণ্ড ব্যালেন্স' সূত্রটি আবিষ্কৃত হয়।

এই 'চেক এণ্ড ব্যালেন্স'-এর মধ্যে নজরুলের প্রেম ও বিদ্রোহ নিহিত। প্রকৃত পক্ষে সমাজের যাবতীয় অনাসৃষ্টির কার্য-কারণে আঘাত করার তাৎপর্যও তাঁর এখানেই। অতএব নজরুল পৃথিবীতে শান্তিময় সমাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য যে মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধন করতে চেয়েছেন, সে-মনুষ্যত্ববোধ এক দার্শনিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ-সম্পর্কে গূঢ় রহস্যের ব্যাখ্যা তাঁর প্রবন্ধে বিধৃত। এখানে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই।

নজরুল তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে একটি অভাবিতপূর্ব সমাজকর্ম সম্পাদন ক'রেছেন। এই সমাজ-কর্মের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ

www.pathagar.com

ক'রতে যেয়ে তিনি বলেন:

> "আমি "নবযুগে" যোগদান করেছি, শুধু ভারতে নয়, জগতে নবযুগ আনার জন্য। এ আমার অহঙ্কর নয়, এ আমার সাধ, এ আমার সাধনা। এই বিদ্বেষ-কলহ-কলঙ্কিত, প্রেমহীন, ক্ষমাহীন অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে, শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে আল্লাহর বান্দা রূপেই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি। ইসলাম ধর্ম এসেছে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে। কোরান মজিদে এই মহাবাণীই উত্থিত হয়েছে।.....এক আল্লাহ ছাড়া আমার কেউ প্রভু নাই। তাঁর আদেশ পালন করাই আমার একমাত্র মানব-ধর্ম।"[২৭]

এ জন্যই নজরুল তাঁর সাহিত্যকে সমাজকর্মের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বলেন:

"আমার কবিতা আমার শক্তি নয়; আল্লার দেওয়া শক্তি—আমি উপলক্ষ মাত্র। বীণার বেণুতে সুর বাজে, কিন্তু বাজান যে-গুণী, সমস্ত প্রশংসা তাঁর-ই। আমার কবিতা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই সাক্ষী; আমি মুছলিমকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য তাদের জড়ত্ব, আলস্য, কর্মবিমুখতা, ক্লৈব্য, অবিশ্বাস দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছি।"[২৮]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নজরুলের সমাজকর্ম কিংবা সাহিত্যকর্ম সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুও সেই মহাশক্তির সমগ্রতায় নিহিত । এ জন্যই তিনি বার বার বলেছেন:

"আমি আমার ক্ষমাসুন্দর আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমা পেয়েছি ও সত্য পথের সন্ধান পেয়েছি। তাঁর বান্দা হবার অধিকার পেয়েছি। আজ আর কোনো অভাব নেই, চাওয়া নাই, পাওয়া নাই।"[২৯]

www.pathagar.com

তিনি আরও বলেন: "আল্লাহ আমার প্রভু, রছুলের আমি উম্মত, আল্ কোরাআন আমার পথ-প্রদর্শক।[৩০]

অতএব নজরুলের চেতনা এক মহা অখণ্ড সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর বিস্তৃতিও সীমাহীন। আর সীমাহীন বলেই তিনি তাঁর এক অভিভাষণে বলতে পেরেছেন:

"আমি এই দেশে, এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশের-ই এই সমাজের-ই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগান-ই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে-কুলে, যে-সমাজে, যে-ধর্মে, যে-দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।'[৩১]

তাহলে উপলব্ধ হয় যে, নজরুল-প্রতিভার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটও রচিত হয়েছে—এক মহাপৃথিবীর পরিমণ্ডলে।

নজরুলের প্রবন্ধগুলোতে মানব জীবন-চর্চার ও পরিচর্যার এক বহুমাত্রিক পদ্ধতি উপলব্ধি করা যায়। সাহিত্য জীবনের বাইরে নয় বলে এক-ই ভাবে সাহিত্য-গবেষণা ও সমালোচনার ক্ষেত্রেও নজরুলের প্রবন্ধগুলোর ইঙ্গিত গভীর তাৎপর্যবহ। নজরুল জীবনকে দেখেছেন খণ্ড নয়—অখণ্ড দৃষ্টিতে, ব্যক্তি নয়—সমষ্টিগতভাবে, সংকীর্ণতায় নয়—মহান আত্মত্যাগে, পরম মঙ্গলময় সত্তার বিশ্বাসে। এ বিশ্বাস শুধু পরিদৃশ্যমান জগতের ব্যবহারিক জীবনে নয়—বরং জ্ঞান-শৃঙ্খলার সমগ্র বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শাখায়ও সংশ্লিষ্ট। অতএব নজরুল-প্রতিভাকে বিশ্লেষণ করতে গেলে কোনো রকম পক্ষপাতদুষ্ট হলে চলবে না বরং সকল মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে নিরঙ্কুশ ও নিরপেক্ষভাবে কেবলমাত্র নজরুলের লেখাগুলো সরাসরি অনুধ্যান করলেই তার বহুমুখী প্রতিভার অখণ্ড স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে।

অতএব নজরুল সম্পর্কে, নজরুলের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নতুন করে ভাববার অবকাশ আছে ব'লে মনে করা যায়।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

১. নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৮২৫।
২. ঐ. পৃ.
৩. ঐ. পৃ. ৮৪৯।
৪. ঐ. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৫।
৫. ঐ. পৃ. ১০২।
৬. ঐ. ১ম খণ্ড. পৃ. ৮৫২।
৭. ঐ. পৃ.
৮. ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫২।
৯. ঐ. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪০।
১০. ঐ. পৃ. ১২৭।
১১. ঐ. পৃ. ১১১।
১২. ঐ. পৃ. ১১৬।
১৩. ঐ. পৃ.
১৪. ঐ. পৃ. ১১৮
১৫. ঐ. পৃ. ১২০-১২১।
১৬. ঐ. পৃ. ১২০।
১৭. ঐ. পৃ. ১২১।
১৮. ঐ. পৃ. ৩২-২৩৫।
১৯. ঐ. পৃ.
২০. ঐ. পৃ. ৭২-৭৩।
২১. ঐ. পৃ.
২২. ঐ. পৃ.
২৩. ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২১।
২৪. ঐ. পৃ.
২৫. ঐ. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০।
২৬. ঐ. পৃ. ৪০।
২৭. ঐ. পৃ. ৭০-৭১
২৮. ঐ. পৃ.
২৯. ঐ. পৃ. ৭০-৭১।
৩০. ঐ. পৃ. ৭০-৭১।
৩১. ঐ. পৃ. ৯১।

www.pathagar.com

বাঙালা কাব্যে রাসূল (স.) প্রসঙ্গ ও নজরুলের 'মরু-ভাস্কর'

মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ*

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক-(রা) এর খিলাফতকালে এতদ্ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটলেও ইসলামের রাজনৈতিক বিজয় সূচিত হয় ১২০৩/১২০৪ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর গৌড় বিজয়ের মাধ্যমে। কিন্তু সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব এসেছে আরও পরে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে ইসলামের সক্রিয় সম্পর্ক সাত শ' বছরের অধিক।[১]

বাঙালা সাহিত্যে প্রথম ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা-(সা.)র নাম অঙ্কিত হয়; ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। রামাই পণ্ডিত তাঁর 'শূন্য পুরাণ'-এর 'নিরঞ্জনের রুষ্কা'-তে** সর্বপ্রথম 'মঁহামদ' শব্দটি ব্যবহার করেন। যেমন:

"ব্রহ্মা হৈল্যা মঁহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল্যা শূলপাণি,
গণেশ হৈল্যা গাজী কার্তিক হৈল্যা কাজি
ফকির হৈল্যা যত মুণি।"

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

**এ-বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য হ'ল–রামাই পণ্ডিত কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে আদি রামাই পণ্ডিত দশম শতকের শেষ ভাগ থেকে একাদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর রচিত বৌদ্ধ মন্ত্র "কলিমা জাল্লাল"–একটি দীর্ঘ ছড়ামূলক কবিতা। এর দু'টি অংশের প্রথম অংশ বিচ্ছিন্ন ক'রে আধুনিক পণ্ডিতগণ "নিরঞ্জনের রুষ্কা" নামে "শূণ্য পুরাণে" মুদ্রণ ক'রেছেন। পুরোটা ছাপেননি। পুরো কবিতাটি মূল নামে রামাই পণ্ডিতের অপর গ্রন্থ " ধর্ম্মপূজা বিধান"-এ পাওয়া যায়। আর ঐ কবিতা ত্রয়োদশ শতকে নয়; একাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রচিত ব'লে গণ্য করা যায়। দেখুন—ড. এস. এম. লুৎফর রহমান। বাঙালীর লিপি-ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস-৩য় খণ্ড, (ধারণী সাহিত্য-সংসদ, ঢাকা-২০০৬) পৃ. ৭৩-১১২।

www.pathagar.com

এসময় হ'তে মুসলিম কবিরা—তাঁদের সকল রচনায় "হামদ্" (আল্লাহ্‌র প্রশংসা) আর "না'ত" (রাসূল-স. এর প্রশংসা) উপস্থাপন করার রীতি-প্রচলন করেন। আর এভাবেই 'মুসলিম বাঙালা সাহিত্যে'র যাত্রা শুরু হয়।

সুল্‌তান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের (১৩৯৭-১৪১০) সমসাময়িক প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহাম্মদ সগীরের (১৩৩৯-১৪০৯) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান 'ইউসুফ-জোলেখা'য় এভাবেই বাঙ্‌ময় হ'য়েছিল নিম্নোক্ত পংক্তি কয়টি:

"জীবাত্মার পরমাত্মা মহাম্মদ নাম।
প্রথম প্রকাশ তথি হৈল অনুপাম॥
যত ইতি জীব আদি কৈলা ত্রিভুবন।
মহাম্মদ হস্তে কৈলা তা সব রতন॥"

দেব-দেবীর বন্দনায় মুখরিত মধ্য যুগের বাঙালা সাহিত্যের মানব-রস সঞ্চয়নের এ-কাজে শাহ মুহাম্মদ সগীরের যারা অনুগামী হ'য়েছিলেন, তাঁরা হ'লেন—দৌলৎ উজীর বাহ্‌রম খান, মুহাম্মদ কবীর, আলাওল, দৌলৎ কাজী, সৈয়দ হামজা, সৈয়দ সুলতান, শাহ্ গরীবুল্লাহ্ প্রমুখ।

সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮) আরাকান অভিজাততন্ত্রের সাথে সুসম্পর্কিত থেকেও মধ্যযুগীয় মুসলিম বাঙালা সাহিত্যের উদ্যোক্তা-পুরুষ হিসেবে স্বাজাত্য চিন্তায় ভাস্বর হ'য়ে উঠেছিলেন। তিনি 'জ্ঞান প্রদীপ'-এ লিখেছেন—

"প্রথমে প্রভুর নাম করিএ স্মরণ
আঠার হাজার আলম যাহার সৃজন।
দ্বিতীএ লই নাম মুস্তাফা পয়গাম্বর
যাহার সিফত আছে রোজ মহাশর।
যতন করি ধরি এ রসূল দুই পাএ
আখের এড়াইবা যদি হিসাবের দাএ।"

www.pathagar.com

সৈয়দ আলাওল (১৫৯২-১৬৭৩ ভিন্ন মতে ১৬০৭-১৬৮০) বাঙালী মুসলিম চিত্তবৃত্তির যুগ-প্রতিনিধিত্বের দাবীদার হওয়ার গৌরবে হ'য়েছিলেন অভিষিক্ত। তিনি তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যে লিখেছেন—

"পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার॥
নিজসখা মহম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই জ্যোতি-মূলে ত্রিভুবন নিরমিলা॥
তাহান পিরীতে প্রভু সৃজিলা সংসার।
আপনে কহিছে প্রভু কোরান মাঝার॥
সেই দীপ জ্যোতিএ উজ্জ্বল ত্রিভুবন।
হইল নির্মল জ্যোতি পাতক নাশন॥
ঘোরাকার দিল পন্দ নর পাপ লীন।
পুণ্য প্রকাশের হেতু হৈল তার দ্বীন।
জন্মিয়া যে জনে না লইল তার নাম,
তাহার হইব নরকের মাঝে ধাম॥"

পুথি কাব্যের মাধ্যমে রসূল-প্রশস্তি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। বাঙালী কবিগণ আরবী-ফারছী কাহিনী কাব্যের ধারায় নবী-কাহিনী অনুবাদের প্রেরণা লাভ করেন। অনেকেই রোমান্টিক আখ্যান রচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হন—উরদু-ফারছী কাব্যের ধারা অবলম্বন ক'রে। ফলে বাঙালা কাব্যে এক নতুন বিষয়-সম্পদ আত্মপ্রকাশ ক'রতে থাকে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের মধ্যেই নবী-চরিত বিষয়ক বেশির ভাগ কাব্য রচিত হ'তে দেখা যায়। মুসলমান কবিদের মধ্যে মহানবী-(স.)র মাহাত্ম্য সূচক জীবনকথা নিয়ে গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের সভাকবি জৈনুদ্দীন-ই সর্বপ্রথম 'রসুল-বিজয়' কাব্য (রচনা কাল ১৪৭১-১৪৮১) রচনা করেন।[২] কাব্যের শুরুতে তিনি রসুল-প্রশস্তি এভাবে গেয়েছেন—

"রসুল বিজয় বাণী সুধারসধার
শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার॥"

www.pathagar.com

কবি জৈনুদ্দীনের ধারা অনুসরণ ক'রে এগিয়ে আসেন শাহ বারীদ খাঁ (১৫১৭-১৫৫০) এবং পরবর্তীতে সৈয়দ সুলতানও (১৫৫০-১৬৪৮)। সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' (রচনাকাল ১৫৮৫-১৫৮৬), 'রসুল-বিজয়', 'ওফাতে রসুল' এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কবি শেখ চান্দ (১৫৬০-১৬৬০), নসরুল্লাহ খান (১৫৬০-১৬৪৫) এবং মুহম্মদ খানও (১৫৮০-১৬৫০) এ-ধারা অনুসরণ করেন। এঁরা সৈয়দ সুলতানের সমসাময়িক এবং শেষোক্তজন তাঁর উপযুক্ত ভাব-অনুসারী ছিলেন।[৩]

আধুনিক বাঙালা সাহিত্যে রসূল-প্রশস্তি বা না'ত রচয়িতা হিসেবে প্রথমেই যে তিন পৃথিকৃৎ-এর নাম উচ্চারণ ক'রতে হয়—তাঁরা হ'চ্ছেন: মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১) এবং মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)। আধুনিক মুসলিম বাঙালা গদ্যের জনক অভিধায় অভিহিত মীর মশাররফ হোসেন মূলতঃ গদ্য লেখক হ'লেও গদ্যে ও পদ্যে 'বাংলা মৌলুদ শরীফ' (১৯০২) নামে একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করেন। কায়কোবাদ লেখেন—'গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ' (১৯০৯) এবং মোজাম্মেল হক লেখেন 'হযরত মোহাম্মদ কাব্য' (১ম খণ্ড)। এক-ই সময়ে শেখ ফজলল করিমের (১৮৮২-১৯৬৬) 'পরিত্রাণ' কাব্যও (১৯০৩) প্রকাশিত হয়। মীরের কিছু কিছু না'ত আজও মিলাদ-মহ্‌ফিলে গীত হয়। যেমন :

"তুমি হে এসলাম রবি
হাবিবুল্লাহ্ শেষ নবী
নতশিরে তোমায় সেবি
মোহাম্মদ এয়া রাসুলুল্লাহ।

তুমি সত্য উদ্ধারিলে
মহাতত্ত্ব প্রকাশিলে
প্রভু-বাণী শুনাইলে
মোহাম্মদ এয়া রাসুলুল্লাহ।"

www.pathagar.com

এ-সময়ের উল্লেখযোগ্য না'ত রচয়িতাদের মধ্যে আরও আছেন—মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭), শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন, মোহাম্মদ দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) প্রমুখ। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র 'মেহেরুল এছলাম' (১৯০৪), শেখ মোহাম্মদ জমির উদ্দীনের 'আসল বাঙ্গালা গজল' (১৯০৭), মোহাম্মদ দাদ আলীর 'আশেকে রসুল' (১৯০৮), তসলিমউদ্দীন আহ্মদের 'জন্মোৎসব' বা 'মৌলুদে নফীসা' (১৯১৫) মুন্সী আজহার আলীর 'সোনার খনি' এবং সৈয়দ আবুল হোসেনের 'বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ' (১৯২৪) প্রভৃতি সাহিত্য-রসযুক্ত ধর্মীয় রচনা হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে এবং সাহিত্য হিসেবে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

বিশ শতকের যাত্রারম্ভে এ-পরম্পরায় রসূল-প্রশস্তি রচনায় এগিয়ে আসেন—অন্যান্য মুসলিম কবিও। এক্ষেত্রে কবি গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭-১৯৬৪) আবির্ভাব বাঙালা না'ত-সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ভক্তিমার্গের এক গীতল পৃথিবী রচনা ক'রেছেন তিনি তাঁর না'ত সমষ্টিতে। তাছাড়া, শাহাদাৎ হোসেন, বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭-১৯৭৯), জসীম উদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬), বেনজীর আহ্মদ (১৯০৩-১৯৮৩), কাজী গোলাম আকবর, মোহাম্মদ সুলতান, আজিজুর রহমান (১৯১৫-১৯৭৯), কাজী কাদের নওয়াজ, সুফিয়া কামাল প্রমুখের নামও স্মর্তব্য।[৪]

বিশ শতকের মাঝামাঝি কালে বাঙালা কাব্যে রসূল-প্রশস্তিমূলক রচনায় বিশেষ আঙ্গিক ও মাধুর্যের সূচনা হয় এবং এক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম এক অনন্য বৈপ্লবিক ধারা সৃষ্টি করেন। ১৯৩১-১৯৪২ সন পর্যন্ত মোটামুটি বারটি বছর সময়সীমায় কবি অসংখ্য ইসলামী গান ও হামদ-না'ত রচনা ক'রে বাঙালা কাব্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। তাঁর রসূল-প্রশস্তিমূলক রচনাসমূহে মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিচিত্র দিক যেমন রূপয়িত হ'য়েছে, তেমনি কবি-মানসের

www.pathagar.com

নানা স্তরও হ'য়েছে উদ্‌ঘাটিত। নিচে কবি-রচিত কিছু উল্লেখযোগ্য না'ত-এর প্রথম লাইন উদ্ধৃত হ'ল :

১. নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া
কে এল মক্কায় আমিনার কোলে
২. তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
৩. সাহারাতে ফুট্‌ল রে রঙিন গুলে-লালা
৪. ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এল রে দুনিয়ায়
৫. তৌহিদের-ই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম
৬. আমার মোহাম্মদ নামের ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়
৭. মোহাম্মদ নাম যতই জপি,
ততই মধুর লাগে
৮. নাম মোহাম্মদ বোল রে মন, নাম আহ্‌মদ বোল
৯. মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে
১০. হে প্রিয় নবী রসুল আমার
১১. হেরা হ'তে হেলে দুলে নুরানী তনু ও কে আসে হায়
১২. মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা,
তুমি বাদশারও বাদশা কমলীওয়ালা
১৩. হে মদিনাবাসী প্রেমিক, ধরো হাত মম
১৪. ইয়া মোহাম্মদ বেহেশত হ'তে
খোদায় পাওয়ার পথ দেখাও। ইত্যাদি।

এরূপ অসংখ্য না'ত তখনকার দিনে বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীতে কে. মল্লিক (মোহাম্মদ কাশেম), আব্বাস উদ্দীন ও অন্যান্য কণ্ঠশিল্পী কর্তৃক রেকর্ড হ'য়েছে, যা আজও মুসলমানদের সামাজিক জীবনপ্রবাহে এক আলোকোজ্জ্বল ভূমিকা পালন ক'রে আসছে।[৫]

এ-ধারায় নজরুল ইসলামের 'মরু-ভাস্কর' কাব্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ ক'রতে হয়। বর্তমান প্রবন্ধে নজরুলের 'মরু-ভাস্কর' কাব্যে রসুলের (স.) জীবন ও দর্শন কীভাবে শিল্পিত হ'য়েছে, সে-সম্পর্কে

www.pathagar.com

আলোচনা করা হবে।

'মরু-ভাস্কর'-রচনাকাল

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) স্বকালসিদ্ধ যুগন্ধর কবি। সাহিত্যের কালজয়ী আবেদন এবং প্রবহমান প্রাসঙ্গিকতা বিচারে কেবল যুগন্ধর-ই নন, তিনি যুগোত্তীর্ণও বটে। নব জাগ্রত বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চৈতন্যের সাগরমন্থন শেষে বাঙালা কাব্যে তাঁর উজ্জ্বল আবির্ভাব।[৬]

রসুল-প্রেমে উজ্জীবিত কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্য পূর্ণ জীবনের অধিকারী। যৌবন বয়সে তথা ১৯১৯ খৃ.অব্দে (১৩২৬ বঙ্গাব্দে) নজরুল সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করেন। ঐ বছর-ই তাঁর লেখায় ইসলামী আবহ লক্ষ্য করা যায়।

১৩২৬-এ নজরুল ইসলাম মূলতঃ গল্পকার। কিন্তু লক্ষণীয়; ঐ বছর-ই তিনি ফারছী মহাকবি শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ-(১৩২০-১৩৮৯) এর কবিতা বলম্বনে 'আশায়' নামে একটি কবিতা লেখেন। আর লেখেন 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' নামক একটি প্রতিবাদী প্রবন্ধ। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নজরুল লেখেন 'খেয়াপারের তরণী' নামক কবিতা, যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ কবিতার মাধ্যমেই নজরুল তাঁর সাহিত্যে প্রথম হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। বলেন—

"নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতেও;
কাণ্ডারী আহ্‌মদ, তরী ভরা পাথেয়।"

এ-বছর-ই (১৯২০) নজরুল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে এক অসাধারণ কবিতা লেখেন। 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম,' (আবির্ভাব)। "মোসলেম ভারত' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩২৭ সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। এর পরের বছর (১৯২১) 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার অগ্রহায়ণ-১৩২৮ সংখ্যায় প্রকাশ পায় নজরুলের ঐ কবিতার দ্বিতীয়

www.pathagar.com

অংশ (তিরোভাব)—যা তিনি হযরত মুহাম্মদ-(স.)এর ওফাত উপলক্ষে রচনা করেন। রসুলুল্লাহ-(স.)-র জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ক এই জোড়-কবিতাই তাঁর সম্পর্কে নজরুল ইসলামের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কবিতা। এরপর বিভিন্ন বিষয়ের উপর নজরুল প্রচুর লেখালেখি ক'রলেও, কাব্যে হযরত মুহাম্মদ-(স.) র পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত লেখা শুরু করেন ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। 'মরু-ভাস্কর'[৭] নামে এর কিছু অংশ 'সওগাত' পত্রিকার বৈশাখ-১৩৩৭ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই 'মরু-ভাস্কর' রচনা সম্পর্কে আব্দুল মান্নান সৈয়দ-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

> "১৯৩০-এর মে মাসে নজরুলের পুত্র বুলবুল (অরিন্দম-খালেদ, ১৯২৬-৩০) বসন্তরোগে মারা যায়। বুলবুল যখন বসন্তরোগাক্রান্ত নজরুল তখন "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ" তর্‌জমা ক'রছেন। বইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে (১৯৩০) বুলবুলের স্মরণে উৎসর্গও ক'রেছিলেন।....বুলবুলের মৃত্যু নজরুলকে এমন গভীরভাবে মথিত ক'রেছিল যে সম্ভবতঃ সেই মৃত্যুশোকের প্রবলতাই তাঁকে গভীর আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। সন-তারিখ মিলিয়ে আমরা দেখেছি এই সময়-ই নজরুলের "মরু-ভাস্কর'-কাব্যগ্রন্থ লেখার সূচনা হয়। একটি পাণ্ডুলিপিচিত্রে দেখেছি "মরু-ভাস্কর"-এর 'অবতরণিকা'র প্রথমাংশের ('যত দুশ্‌মনী ছিল যথা নিল দোস্‌তী আসিয়া জিনে' পর্যন্ত) রচনাকাল: আষাঢ় ১৩৩৭। মনে হয়, বুলবুলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এই কাব্যগ্রন্থ রচনা শুরু হ'য়েছিল।
>
> পরের বছর, ১৯৩১-এ, আঁটঘাঁট বেঁধে নজরুল লেগেছিলেন "মরু-ভাস্কর" রচনায়। কিন্তু ও-বই

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত নজরুল সম্পূর্ণ ক'রতে পারেননি। ১৯৩১-এ নজরুলের যাবার কথা ছিল-ডি. এম. লাইব্রেরীর মালিক গোপালদাস মজুমদারের (১৮৯০-১৯৮০) সঙ্গে শিলঙে। কিন্তু নজরুল চ'লে গিয়েছিলেন দার্জিলিঙে। গিয়েছিলেন 'শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স'-এর মালিক মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর সঙ্গে। 'শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স' থেকে কবির তিনটি বই বেরিয়েছিল: 'রুবাইয়াৎ-ই হাফিজ' (১৯৩০), "নজরুল-গীতিক্য" (১৯৩০) ও "সুর-সাকী" (১৯৩২)। মনোরঞ্জরন চক্রবর্তীই নজরুলকে দিয়ে হযরত মুহম্মদ-(স.)এর জীবনী-কাব্য লেখানোর জন্যে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন দার্জিলিঙে। দার্জিলিঙে সে-সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ও জাহানারা বেগম চৌধুরী ছিলেন। জাহানারা বেগম চৌধুরী, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, অখিল নিয়োগী প্রমুখ সমভিব্যাহারে নজরুল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রতে যান। হৈ চৈ-এ নজরুলের "মরু-ভাস্কর" লেখার কাজ তেমন এগোয়নি। এখন যে-অংশটুকু "মরু-ভাস্করে" আছে তার সবটাই তিনি দার্জিলিঙে লিখেছিলেন। এমনও হ'তে পারে, কলকাতায় পরে বাকি অংশ লিখেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি। লেখার ভঙ্গি দেখে একটানা লিখে গিয়েছিলেন ব'লে মনে হয়। অনেক বছর ধ'রে ছেঁড়াছেঁড়াভাবে নয়। বৈদগ্ধ্য, যথাযথতা, কাব্যভাষা, নজরুলী স্বভাব— সবদিক থেকে মনে হয় ১৯৩০-৩১-এই "মরু-ভাস্কর" যতদূর লেখার লিখেছিলেন; পরে তাঁর মন চ'লে যায় সম্পূর্ণ সংগীতে।"[৮]

www.pathagar.com

সূচী বিন্যাস

'মরু-ভাস্কর' একখানি অপূর্ণ গ্রন্থ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ-(স.)এর পূর্ণাঙ্গ 'জীবনী-গ্রন্থ' কাব্যে রচনা করার ইচ্ছা ছিল নজরুলের। কিন্তু কেন তিনি তা পারেন নি, তা এখনও ইতিহাসের আঁধারে র'য়ে গেছে। কারণ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নজরুল 'মরু-ভাস্কর' রচনার কাজে হাত দেন। আর তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে। এ-সময়ে ৫০-এর বেশী গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ ক'রতে পারলেন অথচ 'মরু-ভাস্কর' রচনার কাজ শেষ ক'রতে পারলেন না কেন? ভবিষ্যতে গবেষকবৃন্দ হয়ত এর যথার্থ কারণ একসময় উদ্ধার ক'রতে পারবেন। যাহোক নজরুল চেয়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ-(স.)এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা ক'রতে। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি-পত্নী প্রমীলা নজরুল উল্লেখ ক'রেছেন— "অনেকদিন আগে দার্জিলিঙে ব'সে কবি এই কাব্য গ্রন্থখানি রচনা আরম্ভ করেন। তিনি তখন আধ্যাত্মিকভাবে নিমগ্ন। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ-(স.)এর জীবনী নিয়ে একখানি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনার কথা তিনি প্রায়-ই ব'লতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাড়াহুড়া ক'রে তিনি বইখানি শেষ করেন।"[৯]

যে-কোন কারণেই হোক, নজরুল 'মরু-ভাস্কর' রচনার কাজ পূর্ণ ক'রতে পারেননি। এ-গ্রন্থে নবী-জীবনের মাত্র ২৫ বছর তথা নবীজী (স.)-এর বিবাহ পর্যন্ত আলোচিত হ'য়েছে। একাব্যের সূচী-পরিচয় নিম্নরূপ।

প্রথম সর্গ:

এতে র'য়েছে সাতটি পরিচ্ছেদ—

(১) অবতরণিকা, (২) অনাগত, (৩) অভ্যুদয়, (৪) স্বপ্ন,
(৫) আলো-আঁধারি, (৬) দাদা ও (৭) পরভৃত।

দ্বিতীয় সর্গ :

এতে র'য়েছে চারটি পরিচ্ছেদ—

www.pathagar.com

(১) শৈশব-লীলা, (২) প্রত্যাবর্তন,
(৩) "মাক্‌কুস সাদর" (হৃদয়-উন্মোচন), (৪) সর্বহারা।

তৃতীয় সর্গ :

এতে র'য়েছে দু'টি পরিচ্ছেদ—
(১) কৈশোর, (২) সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ (স.),

চতুর্থ সর্গ:

এতে র'য়েছে পাঁচটি পরিচ্ছেদ—
(১) শাদী মোবারক, (২) খাদিজা, (৩) সম্প্রদান,
(৪) নও কাবা ও (৫) সাম্যবাদী।[১০]

'মরু-ভাস্কর' অসম্পূর্ণ হ'লেও বাঙালা কাব্যে রসূল-প্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অতুলনীয় ও অসাধারণ হিসেবে বিশেষ স্থান দখল ক'রে আছে।

ঐতিহাসিকতা

কবিরা ভাবুক, দার্শনিক আবার আবেগ-প্রবণ। হৃদয়ের মণি-কোঠায় উচ্ছ্বসিত আবেগ-ই শব্দ, বাক্য ও ছন্দে রাঙ্ময় হ'য়ে কবিতার রূপ গ্রহণ করে। অতএব, ঐতিহাসিক সত্য বজায় রেখে কবিতা রচনা অসম্ভব না হ'লেও—সহজও নয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ-(স.)র জীবন-চরিত কুরআন-হাদীস ও অসংখ্য ঐতিহাসিক সূত্রে সত্যায়িত জীবনেতিহাস। নজরুল নবী-প্রেমে আবেগাপ্লুত হ'য়েছেন ঠিক-ই; তবে অতিরঞ্জন, অসত্য, অযৌক্তিক, অপ্রামাণ্য কোন তথ্য তিনি তাঁর কবিতায় উপস্থাপন করেননি। 'মরু-ভাস্কর'-এ নবী-জীবনের যে বিষয় গুলো আলোচিত হ'য়েছে, তার তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে নবী-(স.)এর জীবনী-বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীর তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখলে —উপর্যুক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ-(স.)এর জীবন-চরিত বিষয়ক কয়েকখানি ইতিহাস-গ্রন্থের পরিচয় নিম্নরূপ—

www.pathagar.com

(১) রসূলের জীবনী বিষয়ক প্রাচীনতম ও প্রমাণ্য গ্রন্থ 'সীরাতুন্নবী (স.)'। লেখক আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ইব্ন হিশাম মুআফিরী (মৃ. ২১৮.)। এ-গ্রন্থ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক বাঙালায় অনূদিত হ'য়ে চার খণ্ডে প্রকাশিত হ'য়েছে।

(২) আল্লামা শিবলী নো'মানী ও সৈয়দ সুলাইমান নাদভী রচিত 'সীরাতুন-নবী (স.)'। ১৯৮৮ সনে 'দি তাজ পাবলিশিং হাউজ', কর্তৃক ৮ খণ্ডে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হ'য়েছে। এ-গ্রন্থ বাঙালায় অনুবাদ করেন এ. কে. এম ফজলুর রহমান মুনশী। এটিও একটি বিখ্যাত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ।

(৩) এ-কালের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থ 'আর-রাহীকুল মাখতুম'। লেখক আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারক পুরী। ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে বাঙালায় অনুদিত হ'য়ে 'আল্ কোরআন একাডেমী' কর্তৃক লন্ডন থেকে প্রকাশিত হ'য়েছে।

(৪) আব্দুল খালেক, এম. এ. কর্তৃক দু'খণ্ডে বাঙালা ভাষায় রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'সাইয়েদুল মুরসালীন'। ১৯৫১ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এর চতুর্থ সংস্করণ।

(৫) গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী'। আহ্মদ পাবলিশিং হাউজ কর্তৃক ঢাকা থেকে সপ্তদশ সংস্করণ ১৯৮০-(প্রথম মুদ্রণ ১৯৪২ খৃ.) খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

(৬) মোহাম্মদ আকরাম খা প্রণীত 'মোস্তফা-চরিত' বাঙালা ভাষায় রচিত একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম কোলকাতায় প্রকাশিত হয়। এর ৪র্থ সংস্করণ ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে 'ঝিনুক পুস্তিকা'—৩/১৩ লিয়াকত এভিন্যু, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে এর আরও সংস্করণ বেরিয়েছে।

উপরে লিখিত ছ'খানি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম তিনখানি আরবী ও উরদু ভাষায় রচিত এবং বাঙালায় অনুদিত; আর শেষোক্ত তিন খানি বাঙালা

www.pathagar.com

ভাষায় রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। আমরা এই ছ'খানি গ্রন্থের সাথে নজরুল ইসলামের 'মরু-ভাস্কর'-এ পরিবেশিত তত্ত্ব ও তথ্যকে মিলিয়ে দেখেছি—তাতে মৌলিক বিষয়ে কোন গরমিল ধরা পড়েনি। দৃঢ় বিশ্বাস নজরুল তাঁর সময়ে প্রাপ্ত আরবী, উরদু ও ফারছী ভাষায় রচিত প্রায় সমস্ত বিখ্যাত গ্রন্থ পাঠ ক'রে, তবেই 'মরু-ভাস্কর' রচনায় হাত দিয়েছিলেন। নজরুল ইসলাম আরবী, ফারছী ও উরদু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি তফসীর-হাদীস ও ইসলামী অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন ক'রেছিলেন ব'লে গবেষকগণ বর্ণনা ক'রেছেন।

'মরু-ভাস্কর'-এর একটি অংশের সাথে আব্দুল খালেক-রচিত 'সাইয়েদুল মুরসালীন'-(প্রথম খণ্ড) এ পরিবেশিত তথ্য মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। যথা—

'মরু-ভাস্কর'-গ্রন্থের প্রথম সর্গের চতুর্থ পরিচ্ছেদে (স্বপ্ন) কবি লিখেছেন—

"প্রভাত-রবির স্বপ্ন হেরে গো যেমন নিশীথ একা
গর্ভে ধরিয়া নতুন দিনের নতুন অরুণ-লেখা;
তেমনি হেরিছে স্বপ্ন অমিনা—যেদিন নিশীথ-শেষে
স্বর্গের রবি উদিবে জননী আমিনার কোলে এসে।
যেন গো তাঁহার নিরালা আঁধার সূতিকা-আগার হ'তে
বাহিরিল এক অপরূপ জ্যোতি, সে বিপুল জ্যোতি-স্রোতে
দেখা গেল দূর বোসরা নগরী দূর সিরিয়ার মাঝে—
ইরান-অধিপ নওশেরোয়াঁর প্রাসাদের চূড়া লাজে
গুঁড়া হ'য়ে গেল ভাঙিয়া পড়িয়া; অগ্নিপূজা-দেউল
বিরান হইয়া গেল গো ইরান নিভে গিয়ে বিলকুল।
জগতের যত রাজার আসন উলটিয়া গেল পড়ি,
মূর্তিপূজার প্রতিমা ঠাকুর ভেঙে গেল গড়াগড়ি।
নব নব গ্রহ তারকায় যেন গগন ফেলিল ছেয়ে,

www.pathagar.com

স্বর্গ হইতে দেবদূত সব মর্ত্যে আসিল ধেয়ে।
সেবিতে যেন গো আমিনায় তাঁর সূতিকা-আগার ভরি'
দলে দলে এল বেহেশ্‌ত হইতে বেহেশ্‌তী হুর-পরী।
যত পশু-পাখি মানুষের মত কহিল গো যেন কথা
রোম-সম্রাট-কর হ'তে ক্রুস খসিয়া পড়িল হোথা।
হেঁটমুখ হ'য়ে ঝুলিতে লাগিল পূজার মূর্তি যত,
হেরিলেন জ্যোতি-মণ্ডিত দেহ অপরূপ রূপ কত!"

'সাইয়্যেদুল মুরসালীন-গ্রন্থের 'নূরে মুহাম্মাদী'-অধ্যায়ে লেখা হ'য়েছে—

"আমিনার মাতৃগর্ভে অনাগত মহামানব সৃষ্টির স্তর পার হইতেছেন। একদা নিশীথে আমিনা স্বপ্নে দেখিলেন যে, কে যেন আসিয়া তাঁহাকে বলিয়া গেলেনঃ তোমার গর্ভে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব অবস্থান করিতেছেন, যখন তিনি ভূমিষ্ঠ হইবেন তখন বলিও—আমি, প্রত্যেক হিংসুকের মন্দ হইতে তাঁহাকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সমর্পণ করিতেছি এবং তাহার নাম রাখিও মুহাম্মদ। ইঞ্জিলে এবং তাওরাতে তাঁহার নাম আহ্‌মদ, যেহেতু আসমান ও জমিনের অধিবাসী কর্তৃক তিনি প্রসংশিত হইবেন। এই স্বপ্নের কথাই পূর্বে আভাস দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে আমিনা একটি নূর দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাতে শামের এলাকায় বুসরা শহরের প্রসাদ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। তাঁহাকে গর্ভধারণ করার পর অন্যান্য গর্ভবতী নারীদের মত তাঁহার অবস্থা হয় নাই। ভূমিষ্ঠ হইবার কাল নিকটবর্তী হইলে আমেনা পুনঃ একটি নূর দেখিতে পাইয়াছিলেন।----------আমিনা কর্তৃক

www.pathagar.com

বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন মুহাম্মদ ভূমিষ্ঠ হইলেন তখন তাঁরে সঙ্গে একটি নূর বহির্গত হইল। ঐ নূরে মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সমস্ত জিনিষ-ই আলোকিত হইয়া গেল। অন্য হাদীসে এই নূরের বর্ণনা এই রূপে দেওয়া হইয়াছে : এই নূরে আমিনা শামের রাজপ্রাসাদ দেখিতে পাইয়াছিলেন।..... ভূমিষ্ঠ হইবার কালে পারস্য সম্রাট খসরুর প্রাসাদ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল এবং উহার চৌদ্দটি চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ঐ রজনীতে শামের তাবরিয়া এবং পারস্যের চাওয়া হ্রদ হঠাৎ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল এবং পার্শীদের সহস্র বর্ষের প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময়ে আব্দুল মুত্তালিব কা'বা গৃহে ছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মূর্তিগুলো স্থানচ্যুত হইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল এবং কা'বার প্রাচীর হইতে ধ্বনি হইল—মুস্তফা জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

'মরু-ভাস্কর'-কাব্যগ্রন্থে দ্বিতীয় সর্গের "শাককুস সাদর' (হৃদয়-উন্মোচন)-এ নজরুল লিখেছেন—

"হালিমা ব'ক্ষে জড়ায়ে ধরিতে ভাঙিল যেন গো চমক তার,
যেন অনন্ত জিজ্ঞাসা ল'য়ে খুলিল কমল-আঁখি বিথার।
"একি এ কোথায় আসিয়াছি আমি"—জিজ্ঞাসে শিশু সবিস্ময়,
চুম্বিয়া মুখ হালিমা জননী—"তোর মার বুকে" কাঁদিয়া কয়।
"ওরে ও পাগল, কি স্বপ্ন-ঘোরে ছিলি নিমগ্ন, বল্ রে বল্!
ওরে পথ-ভোলা, কোন্ বেহশত-পথ ভুলে এলি করিয়া ছল্?
দেহ ল'য়ে আমি খুঁজেছি ধরণী, মনে খুঁজিয়াছি শত সে লোক,
এমনি করিয়া, পলাতকা ওরে, এড়াতে হয় কি মায়ের চোখ?"

এবার বালক মায়ের কণ্ঠ জড়াইয়া বলে, "জননী গো,

www.pathagar.com

কি জানি কে যেন নিতি মোরে ডাকে, যেন সে সোনার মায়ামৃগ!
আজও সে ডাকিতে এড়ায়ে সবারে এসেছিনু ছুটি এ-মরুপথ,
ছুটিতে ছুটিতে হারাইনু দিশা, ভুলিনু আমারে, মোর জগৎ।
এই তরুতলে আসিতে আমার নয়ন ছাইয়া আসিল ঘুম,
হেরিনু স্বপনে—কে যেন আসিয়া নয়নে আমার বুলাল চুম্।
আলোর অঙ্গ, আলোকের পাখা, জ্যোতির্দীপ্ত তনু তাহার,
কহিল সে, 'আমি খুলিতে এসেছি তোমার হৃদয়-স্বর্গদ্বার।
খোদার হাবিব-জ্যোতির অংশ ধরার ধুলির পাপ-ছোঁওয়ায়
হ'য়েছে মলিন, খোদার আদেশে শুচি ক'রে যাব পুনঃ তোমায়।
ঐশী বাণীর আমি-ই বাহক, আমি ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল,
বেহেশ্‌ত হ'তে আনিয়াছি পানি, ধুয়ে যাব তনু মন ও দিল্।
এই বলি মোরে করিল সালাম, সঙ্গিনী তার হুরীর দল
গাহিতে লাগিল অপরূপ গান, ছিটাইল শিরে সুরিভ জল।
তারপর মোরে শোয়াইল ক্রোড়ে, বক্ষ চিরিয়া মোর হৃদয়
করিল বাহির! হ'ল না আমার কোনো যন্ত্রণা কোনো সে ভয়।
বাহির করিয়া হৃদয় আমার রাখিল সোনার রেকাবিতে,
ফেলে দিল, ছিল যে কালো রক্ত হৃদয়ে জমাট মোর চিতে।
ধুইল হৃদয় পবিত্র 'আব-জমজম' দিয়ে জিব্রাইল,
বলিল, 'আবার হ'ল পবিত্র জ্যোতিমহান তোমার দিল্।
এই মায়াবিনী ধরার স্পর্শে লেগেছিল যাহা গ্লানি-কলুষ
যে কলুষ লেগে ধরার উর্ধ্বে উঠিতে পারে না এই মানুষ,
পুত জমজম-পানি দিয়া তাহা ধুইয়া গেলাম—তাঁর আদেশ,
তুমি বেহেশ্‌তী, তোমাতে ধরার রহিল না আর ম্লানিমা-লেশ।'
শেলাই করিয়া দিল পুনঃ মোর ব'ক্ষে রাখিয়া ধৌত দিল্,
সালাম করিয়া উর্ধ্বে বিলীন হইল আলোক জিব্রাইল।"

'সাইয়েদুল মুরসালীন'-গ্রন্থের "শাককে সদর : বক্ষ-বিদারণ" অধ্যায়ে উল্লেখিত হ'য়েছে—

www.pathagar.com

"ধাত্রীমাতা হালীমার গৃহে অবস্থানকালে রসুলুল্লাহ-(স.)এর প্রথম বক্ষ-বিদারণ সংঘটিত হয়। রসুলুল্লাহ্ (স.) একদিন তাঁহার দুধ–ভাইয়ের সহিত বকরী চরাইবার জন্য চারণভূমিতে গমন করেন। এই সময় সাদা লেবাস পরিহিত দুইজন ফিরিশ্‌তা নাজিল হইলেন। উভয়কে তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন ও পলায়নের উপক্রম করিলেন; কিন্তু তাঁহার পেট চিরিয়া কল্‌ব বাহির করিয়া বিদীর্ণ করিলেন ও তাহা হইতে কাল বর্ণের জমাট রক্ত বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন।.....রসুলুল্লাহ্-(স.) এর বয়স ছিল তখন দশ বসর। রসুলুল্লাহ্ (স.) বলিয়াছেন—তাঁহাদের নুরানী চেহারার মত আমি কাহারও চেহারা দেখি নাই, তাহারা আমার দুই বাহু এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে, তাহা আমি জানিতেই পারিলাম না। তাঁহারা অতি সহজে আমাকে চিৎ করিয়া শোয়াইলেন। তাহাতে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানচ্যুত হইল না এবং আমি কোন প্রকার বেদনা অনুভব করিলাম না। তাঁহারা আমার পেট বিদীর্ণ করিলেন। তাহাতে কোন প্রকার রক্তপাত বা ব্যথা অনুভূত হইল না। তাঁহাদের একজন সোনার পেয়ালায় পানি আনিলেন এবং অপরজন আমার অভ্যন্তর ভাগ ধুইয়া ফেলিলেন। তারপর একজন অপরজনকে বলিলেনঃ ইহার দিল্ বিদারণ কর এবং উহা হইতে ঘৃণা ও হিংসা বাহির করিয়া ফেল। তাঁহারা ভিতরের জমাট রক্ত বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। বলিলেনঃ ইহার হৃদয়ে স্নেহ ও দয়া ঢালিয়া দাও। রসুলুল্লাহ্ (স.) বলিয়াছেনঃ একটি তৈলাক্ত

www.pathagar.com

পদার্থ তাঁহারা আমার হৃদয়ে ঢালিয়া দিলেন এবং তাহার উপর চূর্ণ পদার্থের মত কিছু ছিটাইয়া দিলেন। তৎপর আমার বৃদ্ধাংগুলি ধারণ করিয়া তাঁহারা বলিলেনঃ শান্তিতে থাকুন। রসুলুল্লাহ্ (স.)— বলিয়াছেনঃ তখন হইতে আমি হৃদয়ে দুনিয়ার সকলের জন্য অপূর্ব দয়া ও স্নেহ অনুভব করিতে লাগিলাম।"

মরু-ভাস্কর-কাব্যের তৃতীয় সর্গের 'সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ'-পরিচ্ছেদে কবি 'হিলফুল ফজুল' সম্পর্কে লিখেছেন—

"ফেলি" হাতিয়ার হাতে হাত রেখে মিলি ভাই ভাই
এই সে শর্তে হ'ল প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ সবাই
(১) আমরা আরবে অশান্তি দূর করার লাগি'
সকল দুঃখ করিব বরণ বেদনা-ভাগী।
২) বিদেশীর মান-সম্ভ্রম-ধন-প্রাণ যা কিছু
রক্ষিব, শির তাহাদের কভু হবে না নিচু।
৩. অকুণ্ঠ চিতে দরিদ্র আর অসহায়েরে
রক্ষিব মোরা পড়িলে তাহারা বিপদ-ফেরে।
৪) করিব দমন অত্যাচারীর অত্যাচারে,
দুর্বল আর হবে না পীড়িত তাদের দ্বারে।
দুর্বল দেশ, দুর্বল আজ স্বদেশবাসী,
আমরা নাশিব এ-উৎপীড়ন সর্বনাশী।"

'সাইয়্যেদুল মুরসালীন'-গ্রন্থের 'হিলফুল ফজুল'-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হ'য়েছে—

"ফিজার সংগ্রামের অবসানে কুরাইশের বিভিন্ন কবিলা আব্দুল্লাহ্ বিন জুদয়া'নের গৃহে সমবেত হইল। মক্কবাসী ও মক্কায় আগত ব্যক্তিগণকে জুলুম

www.pathagar.com

হইতে রক্ষা করা, জালিমকে দমন করা এবং মজলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তাঁহারা সকলেই এক দৃঢ় অংগীকারসূত্রে আবদ্ধ হইল। এই অংগীকার-ই 'হিলফুল ফজুল' নামে পরিচিত। রসুলুল্লাহ্ (স.) বলিয়াছেন : আমি অংগীকারের সময় আব্দুল্লাহ্-বিন-জুদয়ানের গৃহে উপস্থিত ছিলাম। ইহার বিনিময়ে লাল বর্ণের উট দিলেও আমি গ্রহণ ক'রতে রাজী নই। আজও যদি অনুরূপ অংগীকারের জন্য আহুত হই, আমি নিশ্চয়-ই উপস্থিত হইব।"

'মরু-ভাস্কর' কাব্যের চতুর্থ সর্গের "শাদী মোবারক" ও "খাদিজা" পরিচ্ছেদে কবি লিখেছেন:

.....

"বিপুল বিত্ত-শালিনী "খদিজা" ছিল আরবের চিত্ত-রানী,
রূপ আর গুণে পূজিত তাহায় মুগ্ধ আরব অর্ঘ্যদানি'।
স্তুতি গাহি তার যশ মহিমার হার মেনে যেত কবির ভাষা,
সৌভাগ্যের সায়র-সলিলে সে ছিল সোনার কমল ভাসা।
শুদ্ধাচারিনী সতী সাধ্বী সে ছিল আজন্ম, তাই সকলে
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ভরা নামে ডাকিত তাহারে "তাহেরা" ব'লে।
হজরতের আর খদিজার ছিল এক-ই গোষ্ঠী বংশ-শাখা,
আরব-পূজ্য যশোমণ্ডিত ত্যাগ-সুন্দর গরিমা-মাখা।

আবু তালিবের কাছে এল নিয়ে খদিজার দূত সে সওগাত!
চাঁদ যেন হাতে পাইল শুনিয়া আখেরী-নবীর খুল্লতাত।
তালিবের মনে খুশির বন্যা টইটম্বুর সর্বদাই,
আরবের রানী তাহিরা খদিজা বধূমাতা হবে, আর কি চাই!
আমার "ইবনে আসাদ" বীর
খদিজার পিতৃব্য ধীর

www.pathagar.com

শুভ বিবাহের পয়গাম তারে পাঠাল—এদেশের রেওয়াজ তাই।
দিন ও তারিখ হ'ল সব ঠিক, গলাগলিকরে দুই বেয়াই।

খদিজার ঘরে জ্বলিল দীপালি, নহবতে বাজে সুর মধুর,
খদিজার মন সদা উচাটন বেপথু সলাজ প্রেম-বিঁধুর।
প্রণয়-সূর্য হ'ল প্রকাশ,
ঝলমল করে হৃদি-আকাশ,
তরুণ ধ্যানীর ঘুম ভেঙে যায়, ব্যথা-টনটন চিত্তপুর,
মরু-উদ্যান এল কোথা হতে বন্ধুর পথে যেতে সুদুর।"

'সাইয়েদুল মুরসালীন'-গ্রন্থে "হযরত খাদীজা-(রা.)এর সঙ্গে বিবাহ" অধ্যায়ে বর্ণিত হ'য়েছে:

> "হযরত খাদীজা (রা.) অতি উচ্চ বংশীয়া মহীয়সী মহিলা ছিলেন। তিনি, সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো বোন হইতেন। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই আবার বিধবা হন। উন্নতমনা, দানশীলা, উদার ও কোমল হৃদয়া খাদীজা (রা.) চরিত্রবতী নারীদের আদর্শ ছিলেন। আরবে অন্ধকার যুগেও তিনি 'তাহেরা' বা পবিত্রা নামে পরিচিতা ছিলেন। তিনি বিপুল সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন। বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি রসুলুল্লাহ্-(স.)কে ডাকিয়া পাঠান। মাত্র পঁচিশ বৎসরের যুবক হইলও তাঁহার নির্মল চরিত্রের খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তেজারত-সংক্রান্ত ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও যশ অর্জন করেন। এই সমস্ত কারণেই হযরত খাদীজা (রা.) তাঁহাকে বাণিজ্য দ্রব্যসহ শামদেশে গমন করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রস্তাবে তিনি সম্মতি প্রদান করেন ও

www.pathagar.com

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বুসরা অভিমুখে যাত্রা করেন।..... তেজারতের কার্য সমাধা পূর্বক রসূলুল্লাহ্ (স.) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হাজেরা নামক স্থানে উপনীত হইলে অসহনীয় গরম পড়িতে লাগিল। মাইসারা দেখিতে পাইল যে, দুইজন ফিরিশ্‌তা তাঁহাকে ছায়াদান করিয়া আসিতেছেন। তিনি তাঁহার উটের পিঠে উপবিষ্ট।

এই বার তিনি বাণিজ্যে বিশেষ লাভবান হইলেন। মাইসারা হযরত খাদীজা (রা.) নিকট পাদরীর উক্তি ও ফিরিশ্‌তার ছায়া দানের কথা বর্ণনা করিল। তিনি এই ঘটনা ওয়া'রাকা-বিন-নাও-ফালের শ্রুতিগোচর করিলেন। ওয়া'রাকা বলিলেনঃ যদি তাহা সত্য হয়, তবে নিশ্চয়-ই মুহাম্মদ এই উম্মতের নবী। হযরত খাদীজা (রা.) পূর্ব হইতেই জানিতেন যে, এই উম্মতের মধ্যে একজন নবীর আবির্ভাব হইবে এবং সকলেই সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় আছে। হযরত খাদীজা (রা.) অতি বুদ্ধিমতী, দূরদর্শিনী ও সদ্‌-গুণসম্পন্না রমণী ছিলেন। বাণিজ্যের তিন মাস পরে তিনি রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠান। সেই যুগে রমণী-সমাজে নিজেদের বিবাহের কথা চালাইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। নির্ধারিত তারিখে আবু তালিব ও বংশের রইসগণ হযরত খাদীজা-(রা.)র গৃহে আসিলেন। আবু তালিব বিবাহের খোতবা পাঠ করিয়া পরিণয় কার্য সমাধা করিলেন। চার শত স্বর্ণমুদ্রা বিবাহের মোহর ধার্য করা হইল। কেহ কেহ বলেন যে, বিবাহের সময় হযরত খাদীজা-(রা.) পিতা

www.pathagar.com

জীবিত ছিলেন; কিন্তু রেওয়ায়েত হিসাবে ইহার সত্যতা প্রমাণ হয় না। বিবাহের সময় খাদীজা-(রা.)র বয়স ছিল চল্লিশ বৎসর। হযরত খাদীজা (রা.) ছিলেন রসুলুল্লাহ্-(স.)এর জীবনের প্রথম সহধর্মিণী। তাঁহার জীবিতকালে রসুলুল্লাহ্ (স.) আর কাহারও পাণি গ্রহণ করেন নাই।"

আরবী-ফারছী-উরদু শব্দের ব্যবহার

নজরুল-সাহিত্যের একটি বিশেষন বৈশিষ্ট্য হ'ল—তিনি তাঁর গদ্য ও পদ্য উভয় রকম রচনায় প্রচুর আরবী-ফারছী-উরদু শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন। বিষয়ের কারণেই অনেক আরবী-ফারছী শব্দ কবি ব্যবহার ক'রেছেন, কিন্তু কখনোই তা মাত্রাতিরিক্ত হ'য়ে ওঠেনি। পাদটীকায় কেবলমাত্র 'অবতরণিকা' অংশেই কয়েকটি আরবী-ফারছী শব্দের অর্থ-সংযোজন ক'রেছিলেন। মনে হয়—কাব্যগ্রন্থটি সম্পূর্ণ ক'রতে পারেননি ব'লেই এই অর্থ আর যোগ করা হয়নি তাঁর।[১১] এই গ্রন্থে প্রযুক্ত কিছু আরবী-ফারছী-উরদু শব্দের তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল :

মুয়াজ্জিন, খায়রুম-মিনান্নৌম, সালাত, আরবা, আদম, হাবিব, সাল্লাল্লাহু আলায়হিসাল্লাম, জান্নাত, ফিরদৌস, খোশখবর, খোশ-নসীব, মারহাবা, গুলবাগ, বুলবুল, নৌজোয়ানী, আরাস্তা, আরশ, মুনাজাত, নজরানা, দ'লিজ (দহ্লিজ), গুল, রবিয়ল আউল, শাম, সুবেহ সাদেক, দিদার, পানি, মঞ্জিল, বদ-নসীব, নাকাড়া, কবরগাহ, শাহানশাহ্, বিয়াবান, সি-মোরগ, আখেরী নবী, বাদশাহ্, আব-হায়াত, রেজওয়ান, নওল, গুনাহ্গার, নও-বণিক, বোররাক, নওরোজ, শহদ, লাত-মানাত, দীন, তেলেসমাত, দস্ত, আল্লা, দীন-দুনিয়া, রহমত, ফজুল, সিজদা, নজ্জুম, শারাব, কায়েম, নবুয়ত, সাদিক, তাহেরা, দিলরুবা, শোকর, লোহু, কাফেলা, সাকিম, সালাম, রোজ কিয়ামত, শিরীন, বুলন্দ নসীব, শাদী, মহ্ফিল, নওশা, জলসা, নকীব, মালিকুল

www.pathagar.com

মউত, আউলিয়া, আম্বিয়া, দরবেশ, সিদ্দিক, কসম ইত্যাদি।

এর মধ্যে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী-মুসলমানের অপরিচিত আরবী-ফারছী শব্দ নেই ব'ললেই চলে। এই গ্রন্থের কাব্যভাষা কবির-ই 'খালেদ' বা 'ওমর ফারুক' কবিতার অনুরূপ। আলোচ্য কাব্যে আরবী-ফারছী শব্দ আরো থাকা উচিত ছিল।

ছন্দ-রীতি

নজরুল তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি "মরু-ভাস্কর" কাব্য গ্রন্থের চারটি সর্গে আঠারটি পরিচ্ছেদে যে কাব্য শৈলী বা ছন্দ-বৈচিত্র্য প্রদর্শন ক'রেছেন, তা অতুলনীয়। এ-কাব্যে তিনি তাঁর কাব্য-প্রতিভার পূর্ণতারও বেশী কিছু প্রদর্শন ক'রেছেন ব'লে মনে হয়।

নজরুল ইসলামের সর্বাধিক প্রিয় ছন্দ ৬-মাত্রার মাত্রাবৃত্ত। "মরু-ভাস্কর" কাব্যগ্রন্থে ৬-মাত্রার মাত্রাবৃত্তই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হ'য়েছে। এই অসম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থের প্রথম ও শেষ অংশের ছন্দও ছ'-মাত্রার মাত্রাবৃত্তই। আরো লক্ষণীয়: নজরুল যখন-ই জীবনীভিত্তিক কাব্য-কবিতা লিখেছেন, তখন-ই অবলম্বন করেছেন এই ছন্দ। যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পর্কে 'ইন্দ্র-পতন' (চিত্ত-নামা') , কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে 'সত্য-কবি' ("ফণি-মনসা"), লেখিকা ও সমাজসেবী মিসেস এম. রহমান সম্পর্কে 'মিসেস এম, রহমান' ("জিঞ্জীর"), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে 'রবিহারা' (ন-র), মাওলানা মোহাম্মদ আলী সম্পর্কে 'মাওলানা মোহম্মদ আলী' (ন-র), দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সম্পর্কে 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের তিরোধানে' (ন-র) প্রভৃতি।

কবি "মরু-ভাস্কর" কাব্যগ্রন্থে এই ৬-মাত্রার মাত্রাবৃত্তই সর্বাধিক ব্যবহার ক'রেছেন—কিন্তু তারও নানা রকমফের আছে। যেমন :

১. জেগে ওঠ্ তুই রে ভোরের পাখী, নিশিপ্রভাতের কবি
লোহিত সাগরে সিনান করিয়া উদিল আরব-রবি।

(অবতরণিকা)

www.pathagar.com

২. শত শতাব্দী যুগ-যুগান্ত বহিয়া যায়
ফিরে-নাহি আসা স্রোতের প্রায়
চলে গেল 'হাওয়া', 'আদম', 'শিশ' ও 'নূহ' নবী—
জ্বলিয়া নিভিল কত রবি!

(অনাগত)

৩. ধেয়ান-শুদ্ধ বিশ্ব চমকি মেলে আঁখি
আরবের মরু আজিকে পাগল হ'ল নাকি?

৪. ধন্য মক্কা, ধন্য আরব, ধন্য এশিয়া, পুণ্য দেশ,
তোমাতে আসিল এমন নবী গো,
তোমাতে আসিল নবীর শেষ।

(অনাগত)

৫. বাদলের নিশি অবসানে মেঘ-আবরণ অপসারি'
ওঠে যে সূর্য-প্রদীপ্ততর রূপ তার মনোহারি।
সিক্ত শাখায় মেঘ-বাদলের ফাঁকে
'বৌ কথা কও' পাপিয়া যখন ডাকে—
সে গান শোনায় মধুরতর গো সজল জলদচারী।
বর্ষায় ধোওয়া ফুলের সুষমা বর্ণিতে নাহি পারি।

(আলো-আঁধারি)

৬. পালিত বলিয়া অপর পাখীর নীড়ে
পিকের কণ্ঠে এত গান ফোটে কি রে?

(পরভৃত)

৭. বাজ পড়া তালতরু সম একা বৃন্তহীন
দাঁড়ায়ে বৃদ্ধ মুত্তালিব
আকাশ-ললাট রাখিয়া নিশি ও দিন
দেখায় তাহারা বদ্‌নসিব!

(সর্বহারা)

www.pathagar.com

"মরু-ভাস্কর" কাব্য গ্রন্থে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ এই ক'রকমে ব্যবহৃত হ'য়েছে।

চতুর্থ সর্গের 'সম্প্রদান' অধ্যায়টিতে ৮+৮+১০ মাত্রার ত্রিপদীতে নজরুল যে-অক্ষরবৃত্ত ব্যবহার ক'রেছেন, সমগ্র নজরুল-কাব্যে তার আর দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। উদ্ধৃতি:

"বাজিল বেহেশ্‌তে বীণ আসিল সে শুভদিন
মুক্তি-নাট-নটবর সাজে বর-বেশে
সুন্দর সুন্দরতর হ'ল আজ ধরা 'পর

সন্ধ্যারানী বধূ বেশে নামিল গো হেসে।"
(সম্প্রদান)

কবি, এ-কাব্যের একাংশে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের হিসেবে স্বাধীনতা নিয়েছেন—'বয়সের বন্ধনে/ কে বাঁধিবে যৌবনে'। 'বন্ধন' ও 'যৌবন' অক্ষরবৃত্তের হিসেবে তিন মাত্রার; কিন্তু এই কবিতায় মাত্রাবৃত্ত-সুলভ ৪-মাত্রায় প্রযুক্ত। স্বরবৃত্ত ছন্দও কোথা-কোথাও ব্যবহার করা হ'য়েছে। যেমন :

"বিশ্ব-মনের সোনার স্বপন কিশোর তনু বেড়ায় ঐ
তন্দ্রাঘোরে অন্ধ আঁখি নিখিল খোঁজে কই সে কই।
বাজিয়ে বাঁশি চরায় উট,
নিরুদ্দেশে দেয় সে ছুট,
'হেরা'র গুহায় লুকিয়ে ভাবে—এ আমি তো আমি নই।
অতল জলে বিম্ব সম ফুটেই কেন বিলীন হই।"
(কৈশোর)

নজরুলের প্রিয় ৩+৪+৪+৪ মাত্রার পর্বভাগ সম্পন্ন স্বরবৃত্ত দু'টি স্থানে প্রয়োগ ক'রেছেন কবি:

না-জানা আনন্দে গো 'আরাস্তা' আজ আরব-ভূমি,

www.pathagar.com

অ-চেনা বিহগ গাহে, ফোটে কুসুম বে-মরশুমী।
আরবের তীর্থ লাগি ভিড় করে সব বেহেশ্‌ত বুঝি;
এসেছে ধরার ধুলায় বিলিয়ে দিতে সুখের পুঁজি ।

(স্বপ্ন)

এ-কাব্যগ্রন্থের সব চেয়ে বিস্ময়কর ছন্দ—মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মিশেলে তৈরী একটি কবিতাংশ। নজরুল ইসলাম আর একবার (৫-মাত্রার) মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মিশেলে একটি অপরূপ গজল লিখেছিলেন। 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে' নামের এই গজলটি বেরিয়েছিল জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪-এর 'কল্লোল' পত্রিকায়। প্রথম স্তবকটি এ রকম:

"ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা।
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা।
আগে মন ক'রলে চুরি মর্মে শেষে হানলে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা।"

এর প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙক্তি ৫-মাত্রার মাত্রাবৃত্তে ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তি স্বরবৃত্তে রচিত। মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের এই মিশেলের সাহসেই ভর রেখে নজরুল "মরু-ভাস্কর"-এর 'অবতরণিকা'র দ্বিতীয়াংশ ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তে লিখেছেন। কিন্তু এখানে এগিয়ে গিয়েছেন আরো এক ধাপ। এক-ই পঙ্‌ক্তির প্রথমাংশ মাত্রাবৃত্ত ও শেষাংশ স্বরবৃত্তে রচিত হল। চারটি লাইন উদ্ধৃত হ'ল—

অভিনব নাম শুনিলে রে ধরা সেদিন—'মোহাম্মদ'।
এতদিন পরে এল ধরার প্রশংসিত ও 'প্রেমাস্পদ'।
চাহিয়া রহিল সবিস্ময় ইহুদী আর ঈসাই সব,
আসিল কি ফিরে এত দিনে সেই মসীহ মহামানব?"

মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মিশেলে এখানে একটি আলাদা ধ্বনি সৃষ্টি হ'য়েছে। উদ্ধৃত অংশের প্রথমাংশের প্রথম পর্ব ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত,

www.pathagar.com

শেষাংশ অপূর্ণ পর্ব। পাশে-সরানো দ্বিতীয়াংশ স্বরবৃত্ত সম্পন্নঃ

"অভিনব নাম/শুনিল রে ধরা সেদিন-/'মোহাম্মদ'!
এতদিন পরে/এলো ধরার 'প্রশংসিত/ও প্রেমাস্পদ'।
চাহিয়া রহিল/সবিস্ময় ইহুদী আর/ঈসাই সব,
আসিল কি ফিরে/এতদিনে সেই মসীহ/মহামানব?

'অভিনব নাম', 'এতদিন পরে', 'চাহিয়া রহিল' ও 'আসিল কি ফিরে' ৬-মাত্রার মাত্রাবৃত্ত। 'শুনিল রে', 'এলো ধরায়', 'সবিস্ময়', 'এতদিনে' মাত্রাবৃত্তের-ই পঙ্‌ক্তিশেষের (এখানে পঙ্‌ক্তি-অংশের) অপূর্ণ পর্ব। ডাইনে-সরানো ছত্রগুলো স্বরবৃত্ত ছন্দে নিষ্পন্ন।

অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত—বাঙালা কবিতার এই প্রধান তিন ছন্দই "মরু-ভাস্কর" কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত হ'য়ে, একে একটি অভিনবত্ব দিয়েছে। এমনকি, এক-ই পরিচ্ছেদে কবি অনেক সময় বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার ক'রেছেন। পরীক্ষামূলক মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মিশেলও আছে এই কাব্যগন্থে—যেমন আছে পরীক্ষামূলক অক্ষরবৃত্তের ত্রিপদী ধাঁচের কবিতা রচনার ফিরতি প্রয়োগ। সব মিলিয়ে ছন্দের দিক থেকেও "মরু-ভাস্কর" এক অসামান্য কাব্যগ্রন্থ।[১২]

নজরুল তাঁর "মরু-ভাস্কর" কাব্যগন্থে অন্ত্যমিল, অনুপ্রাস, মধ্যমিল সহ নানারূপ কাব্য কুশলতা প্রয়োগ ক'রে, গ্রন্থখানিকে অনবদ্য ক'রে তুলেছেন। এ ছাড়াও কবিতায় উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্র-কল্পের ব্যবহার, যা নজরুল-কাব্যের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য; তার অজস্র উদাহরণ লক্ষ্য করা যায় 'মরু-ভাস্কর' কাব্যগ্রন্থে।[১৩]

উপসংহার

হযরত মুহম্মদ (স.) পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব। পৃথিবীর অজস্র ভাষায় তাঁর জীবন ও কীর্তি নিয়ে সাহিত্য রচিত হ'য়ে চ'লেছে। মধ্যযুগে ছিল কেবল কবিতায়, আধুনিক যুগে গদ্যেও। বস্তুতঃ হযরত মুহম্মদ-(স.)-ই বাঙালা সাহিত্যের সর্বাধিক আলোচিত ও প্রশংসিত

www.pathagar.com

একক ব্যক্তিত্ব এবং যতদিন বাঙালা ভাষা থাকবে, বাঙালী মুসলমান থাকবে, ততোদিন বাঙালা ভাষায় হযরত মুহম্মদ-(সা.)-এর কীর্তিগাথা রচিত হ'তেই থাকবে। বাঙালী মুসলমানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভূ, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, স্বভাবতঃ-ই এ-বিষয়ে আমাদের বঞ্চনা করেননি। তাঁর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি—রসুলুল্লাহ্ (স.) সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গান—যা পরম সাহিত্যিক ঐশ্বর্যে বৈভবময়। নজরুল ইসলামের 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' (আবির্ভাব ও তিরোভাব) যুগ্মকবিতা, তাঁর রচিত অনেকগুলি 'না'ত' এবং জীবনীকাব্য "মরু-ভাস্কর" বাঙালা সাহিত্যে অতুলনীয় অবদান। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে বাঙালী মুসলমানের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভা যে-ভাষায় মহিমান্বিত ক'রে তুলেছেন, তা আমাদের নিত্যপাঠ্য ও নিত্যশ্রোতব্য হওয়া উচিত—তাহ'লেই আমাদের মানস- ভাণ্ডার শুচিস্মিত হ'য়ে উঠবে।[১৪]

ব্যক্তি জীবনে নজরুলের হয়তো নানামুখী প্রবণতা ছিল,—কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক জীবন-স্বভাব ও সচেতনতা বিস্ময়কর স্বচ্ছ। কখনই নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্বজাতি-স্বধর্মকে তিনি বিস্মৃত হননি। তাঁর জীবনের কোন পর্যায় থেকেই অমন উদাহরণ দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে 'মরু-ভাস্কর' ও তাঁর এক অবিস্মরণীয় অবদান।[১৫]

বিশ্ব-ইতিহাসের সর্ব শ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব হযরত মুহাম্মদ-(স.) এর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, জীবন-দর্শন ও জীবনাদর্শের দ্বারা কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম গভীরভাবে প্রভাবিত হ'য়েছিলেন। তাই তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে, অনুপম কাব্য শৈলীতে এক কালোত্তীর্ণ কাব্য গ্রন্থ 'মরু-ভাস্কর' রচনা ক'রেছিলেন। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, কবি নজরুল ও তাঁর "মরু-ভাস্কর" বাঙালী জাতি ও বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাসে এক সোনার ফসল ব'লে বিবেচিত হবে চিরকাল।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

১. মুকুল চৌধুরী। "বাংলা কবিতায় রসুল-প্রশস্তি এবং ঐতিহ্যবাদের নয়া প্রবণতা", অগ্রপথিক, (ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী-সংখ্যা-১৪১৮ হিজরী) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, জুলাই-১৯৯৭, পৃ. ২৩৯। মো. ফারুক হুসাইন। "বাংলা কাব্যে মহানবী (স.)", মাসিক মদীনা, ঢাকা, জুন-১৯৯৯, পৃ. ১১৭।

২. মুহাম্মদ শাহাব উদ্দীন। "বাংলা কাব্য-ধারায় ইসলামী চেতনা ও রসুল-প্রশস্তি", অগ্রপথিক, (পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী-সংখ্যা ১৪২২), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন-২০০১, পৃ. ১৬৯। অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম। "বাংলা ভাষায় ইসলামী-সাহিত্য", অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০০। মো: ফারুক হুসাইন। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

৩. মুকুল চৌধুরী, প্রাগুপ্ত পৃ. ২৪১-২৪২। অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম। "বাংলা ভাষায় সীরাতে রসুলুল্লাহ্-চর্চা", সীরাত- স্মরণিকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৪১৬ হিজরী, পৃ. ১০১-১০২।

৪. বিস্তারিত দেখুন—মুস্তাফা মাসুদ, "রাসূল-চর্চা: সূচনা ও বিকাশের ধারা",ঈদে মিলাদুন্নবী-স্মরণিকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৪২১ হিজরী, পৃ. ১৩২-১৩৩। মুকুল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪-২৪৬। শাহাবুদ্দীন আহ্মদ। "বাংলা-কাব্যে রসুল (সা.)", সীরাত-স্মরণিকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৪১৫ হিজরী, পৃ. ১২০-১২১। মো. আব্দুল কাসেম। পুঁথি সাহিত্যে মহানবী (স.), ঢাকা, তাওহীদ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯২।

৫. মুহাম্মদ শাহাব উদ্দীন। "বাংলা কাব্য-ধারায় ইসলামী চেতনা ও রসুল-প্রশস্তি", প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৩।

৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ। নজরুল-মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন-১৯৯৩, পৃ. ১৩।

৮. বিস্তারিত দেখুন—আব্দুল মান্নান সৈয়দ। নজরুলের 'মরু-ভাস্কর', অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন-২০০১, পৃ. ১১৮-১২০। অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম। "বাংলা ভাষায় সীরাতে রসুলুল্লাহ্-(স.)চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬। মুস্তাফা মাসুদ। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

৯. কাজী নজরুল ইসলাম। মরু-ভাস্কর, প্রকাশক : জোহরা খানম, ৯ এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯: ১৯৫৭। ভূমিকা দেখুন।

১০. নজরুল-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, মে-১৯৯৩, পৃ. ৪২-১০০।

১১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

১২. ঐ, ১২৬-১২৯।

১৩. ঐ, ১৩১-১৩৩।

১৪. ঐ, পৃ. ১৩৪।

১৫. ঐ, পৃ. ১৩৫।

www.pathagar.com

নজরুল-সঙ্গীতে হাস্যরস

ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল*

বাঙ্‌লা সঙ্গীত জগতের অনন্য সাধারণ স্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম। সঙ্গীত রচনায় কবি নজরুলের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। শুধু সংখ্যার দিক থেকে যে, নজরুল একালের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব তা নয়, তাঁর গানের বৈষয়-বৈচিত্র্য, সুর-বৈচিত্র্য, আমাদের সঙ্গীত-পিপাসু মনকে মুগ্ধ করে—আকৃষ্ট করে—অভিভূত করে। আনন্দ-বেদনায়-সংকটে, দীর্ঘদিন নজরুল বাঙালী শ্রোতাকে উদ্দীপ্ত ক'রে—সম্মোহিত ক'রে রেখেছেন। অজস্র রাগ-ভিত্তিক সঙ্গীতের রচিয়তা তিনি—বহু রাগ-রাগিনীর মিশ্রণে নতুন সুর, নতুন রাগের স্রষ্টাও তিনি।

বাল্য কালেই নজরুল ইসলামের সঙ্গীত রচনার ভিত্তি গঠিত হ'য়েছিল। বালক নজরুল অল্প বয়সেই তাঁর গ্রামের লেটো গানের দলের সঙ্গে যুক্ত হন। আর ঐ লেটো দলের জন্য তিনি কিছু গানও রচনা করেন। যেমন—

১. চাষ কর দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এতে...।
২. আমি আল্লা নামের বীজ বুনেছি
এবার মনের মাঠে...।

বাঙ্‌লা সঙ্গীতে নজরুলের বড় অবদান গায়কের স্বাধীনতা—'যেখানে শিল্পীর স্বাধীনতা নেই—সেখানে নূতনের কোন ইঙ্গিত নেই'—সুর বিস্তারের স্বাধীনতাই শিল্পীকে স্তরে স্তরে নতুন সৃষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নজরুলের গানের পার্থক্য এখানেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে অপরের সুর দেওয়া পছন্দ ক'রতেন না। তাঁর

* প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

গানে গায়কের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হ'য়েছে বলা যায়। মার্গ সঙ্গীতে সমন্বয় হওয়া সম্ভব—এই বিশ্বাস থেকে রবীন্দ্রনাথ রাগ-ভিত্তিক সঙ্গীত রচনা ক'রেছিলেন। আর নজরুল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপর নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রেছেন। তিনি কিছু মিশ্র রাগের আবিষ্কারকও। একটি সঙ্গীতের মধ্যে নজরুল একাধিক রাগ-রাগিনীর সংযোগ ঘটিয়েছেন। একটি রাগকে ভেঙ্গে বহু রাগ- রাগিনীর সৃষ্টি ক'রেছেন। তাঁর নিজস্ব কতকগুলি সুর, গায়ক-শ্রোতাদের যথেষ্ট মনোরঞ্জন করে, একথা বলা যায়—বিনা তর্কে, বিনা দ্বিধায়। তাঁর সৃষ্ট তথা অবিষ্কৃত রাগিনী বা সুর হ'চ্ছে—বনকুন্তলা, সন্ধ্যামালতী, দোলন চম্পা, নির্ঝারিনী, বেণুকা ইত্যাদি।

বলা আবশ্যক, তাঁর সৃষ্ট বা আবিষ্কৃত মিশ্র রাগের গানগুলি-ই প্রকৃতপক্ষে নজরুলের খ্যাতির তথা নজরুলের জনপ্রিয়তার মূল।

নজরুলের জীবদ্দশায় তাঁর সাহিত্য-সঙ্গীত সম্পর্কে বহু আলোচনা হ'য়েছে। তবে সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনায়, তাঁর 'হাসির গান' সম্পর্কে আলোচনা হ'য়েছে—অতি সামান্য। তাঁর সঙ্গীতে হাস্যরসের যে-সমাবেশ ঘটেছে—তার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। হাস্যরসের গানগুলিতে নজরুলের মন-মানসিকতার এক অভিনব প্রকাশ ঘ'টেছে।

নজরুলের গানের হাস্যরস সম্পর্কে আলোচনাকালে, বলা দরকার, কবির হাসির গানগুলিতেও—তাঁর হাসির গানের বিষয়বস্তু বহু বিচিত্র। এ-সব সঙ্গীতে আছ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কটাক্ষ। আছে সেকালের অনেক সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান—অনাচার, কুসংস্কার, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামীর প্রতি ইঙ্গিত। এই সব ভণ্ডামি বা প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে কবির বিক্ষোভের প্রকাশ আছে এ-সব সঙ্গীতে। আরও আছে তৎকালীন রাজনীতির পটভূমি—দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন—ব্যক্তি-মানুষের প্রেম-ভালবাসার কথাও। এমন কি বাঙালী জীবনের আলস্য, ভীরুতা, কূপমণ্ডুকতা প্রভৃতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ।

www.pathagar.com

বাঙ্গালীর ভীরুতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে নজরুলের একটি হাসির গানের কয়েক চরণ এরকম—

"থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়
নিমেষে যোজন ফর্‌সা।
মরণ হরণ নিখিল শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা।"

(চন্দ্রবিন্দু/শ্রীচরণ ভরসা)

নজরুলের কবিতা বা সাধারণ সঙ্গীতে যে প্রসঙ্গ বা বিষয়বস্তুর প্রকাশ দেখা যায়, তার হাসির গানগুলিতেও সে-সব বিষয়-ই প্রাধান্য পেয়েছে। বলা প্রয়োজন, তাঁর হাসির গানগুলি শুধু হাস্যরসের আকর নয়—এই সব গানের অন্তরালে কবির তীব্র ক্ষোভ, মনোবেদনা আর দেশাত্মবোধেরও প্রকাশ ঘ'টেছে। কিন্তু শুধু হাসি-ই কি এই সব সঙ্গীতের লক্ষ্য ছিল? হাসির অন্তরালে র'য়েছে সীমাহীন ক্রন্দন—কবির অন্তরাত্মায় যে-অন্তর্জ্বালা—যে-বেদনা—তার-ই বাণীরূপ এ-সব সঙ্গীত।

বিষয়বস্তু অনুসারে নজরুলের হাস্যরসাত্মক সঙ্গীতসমূহ এভাবে শ্রেণীভুক্ত করা চলে—

১. নিছক হাস্যরসাত্মক গান—বিশুদ্ধ হাস্যরস-ই এর লক্ষ্য।
২. রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা বিষয়ক গান।
৩. গতানুগতিক বাঙ্গালী জীবনের বিড়ম্বনা বিষয়ক গান।
৪. দেশ-প্রেম মূলক গান।
৫. ধর্মীয় গোঁড়ামি বা কুসংস্কার-বিরোধী গান।
৬. তৎকালীন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বিষয়ক গান।
৭. বিদেশী শাসন ও স্বাধীনতা বিষয়ক গান।
৮. বিদেশী সংস্কৃতির অনুকরণের প্রতি কটাক্ষ মূলক গান।
৯. বিদেশী শিক্ষার প্রতি কটাক্ষ মূলক গান।

www.pathagar.com

নজরুল ইসলামের হাসির গানের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর রচিত কতকগুলি গীতি-নাট্যেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁর এই নাট্য রচনাগুলির আয়তন অতি ক্ষুদ্র—এগুলোর মধ্যে কিছুগানও সন্নিবেশিত হ'য়েছে। তাঁর গীতি নাট্যগুলো হ'চ্ছে—১. অতনুর প্রেম ২. আল্লার রহম ৩. কবির লড়াই ৪. কলির বৌ ৫. কানা মাছি ভোঁ ভোঁ ৬. কাবেরী তীরে ৭. খুকী ও কাঠবেড়ালী ৮. গুল্ বাগিচা ৯. ছিনিমিনি খেলা ১০. জুজুবুড়ির ভয় ১১. পণ্ডিত মশায়ের বাঘ শিকার। ১২. বাঙালীর ঘরে হিন্দীয়ানা।[৮]

এই গীতি-নাট্যগুলির প্রধান বিষয় প্রেম। কিন্তু এগুলির মধ্যে কিছু ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কটাক্ষ আছে। 'কবির লড়াই'কে কবি নজরুল ব'লেছেন—'কমিক নক্‌শা'। কবিয়ালকে যে-লোকটি পেছন থেকে পাঠ ক'রে (প্রম্পটার) শোনাচ্ছে, সে আসল খাতার বদলে, ধানের হিসাবের খাতা থেকে পাঠ ক'রে শোনাচ্ছিল—তখন কবিয়াল প্রম্পটারের ভুল ধ'রে ফেলে ব'লছে—

"ধানের খাতার হিসাব ব'লে
কুলমান মোর সব খোয়ালি।
ষাঁড়ের মাথায় টুঁশ মারতে এসেছে ঐ ভেড়া
পাহাড়ে মাথা ঠুকতে এলো টেকো মাথা নেড়া।"

প্রতি পক্ষের উত্তর—

"বলি গুমানি নাম নিয়ে তুই গুমান করিস এত
ঐ নামের প্রথম অক্ষর কি জানে সকলে তো
হায় হায় মরি গুমানি।"

'কাবেরী তীরে'ও প্রেম-বিষয়ক নাট্যরচনা। 'পণ্ডিত মশায়ের বাঘ শিকার' কীর্তনের সুরে রচিত। এ-গানটি এরকম—

"ওহে রসিক রসাল কদলী
ভাবুকের তুমি ভাবের আধার—পেটুকের প্রাণ পুতলী।
তুমি যুগে যুগে বর্তমান

www.pathagar.com

বৃন্দাবনে মোহন বাঁশী বাঙলায় মর্তমান।"

'পুরানো বলদ নতুন বৌ'-এ আছে—'গাড়োয়ানের মুখের গান'। বলদকে উদ্দেশ্য ক'রে গাড়োয়ানের উক্তি—

"বলদ চল্‌রে তাড়াতাড়ি।
বৌ তৈরী ক'রেছে আমার লাইগ্যা নতুন গুড়ের পিঠা
সেই পুঠল পিঠার চাইতে তার মকুল সারা মিঠা
তার মুখ দেইখা ফেইলে রাখি খেজুর রসের হাড়ি
বলদ চল্‌রে তাড়াতাড়ি।"

এখানে উপমা পল্লীজীবন থেকে গৃহীত। গ্রামীণ জীবনের একটি আশ্চর্য সুন্দর চিত্র এখানে প্রতিফলিত।[৯]

বাঙালী মেয়ের হিন্দীগান শিখতে গিয়ে তার পিতামহীর হিন্দী গান শুনে হাস্যের সঞ্চার হ'লো। অবশ্য এ নিছক নির্দোষ হাসি—শিক্ষক মহাশয়ও তেমনি হিন্দী ভাষায় পণ্ডিত।

"বিজুলিয়া মোরি বাজি ঝনন
শামহুঁ জাগে ন ন হুঁ জাগে
আশুর জাগে সব কুটুমকে লোওয়া
মহম্মদ শা সাথ সদারঙ্গ জাগে
নয়ন মিনু মোর হরিতে চরণ।"

এ-গানের অর্থ শিক্ষকের মতে এরূপ—বিছানা ঝন ঝন কইরা বাজনা বাজিতেছে—শাশুড়ী জাগে—ননদ জাগে—আরও জাগিতেছেন মহম্মদ শা সদারঙ্গ মিয়ারে লইয়া—তাই রাধা কইতেছেন—কি কইরা হরির কাছে যাইমু।

এবার নজরুলের বিশুদ্ধ হাসির গানগুলির উল্লেখ ক'রছি।

এই শ্রেণীর গানের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ ক'রতে হয়—বাঙালীর

www.pathagar.com

পারিবারিক জীবনে যে-সব আত্মীয়ের সঙ্গে ঠাট্টার সম্পর্ক বিদ্যমান—সে-সব প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত গান বা কবিতা। অবশ্য এগুলিকে কবিতা না ব'লে গান বলাই সমীচীন। শ্যালক-শ্যালিকার সঙ্গে ভগ্নিপতির সম্পর্ক—ভ্রাতৃবধূ ও দেবর- ননদ-নন্দাই-এর সম্পর্ক প্রভৃতি নিয়ে বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক গান (কবিতা) আছে নজরুলের। এমনকি,স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং বহু সন্তানদায়িনী স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে সর্ম্পক নিয়ে—এমন হাস্যরস অস্বাভাবিক নয়। তার পর দুই বেয়াই ও বেয়াইনের মধ্যেও হাস্যমধুর সম্পর্ক বিদ্যমান; বাঙালী সমাজে। নজরুলের গানে এ-সব প্রসঙ্গ নিয়ে হাস্য-উজ্জ্বল চিত্র আছে। কবির সেই বিখ্যাত রচনাটি দিয়ে শুরু করা যাক।

১. "যদি শালের বন হতো শালার বোন"।
শালার বোনকে নিয়ে ভগ্নিপতির জীবনব্যাপী কত কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা—তবে শত যন্ত্রণার মধ্যেও সংসারের হালটি ধ'রে আছে—ঐ শ্যালকের বোন্‌টি; দুঃখে, দারিদ্র্যে, আনন্দে, সংকটে ওই তো সংসার-মরুতে মরুদ্যান স্বরূপ। গৃহিনীর ভ্রাতা নিখোঁজ। হয়তো অকারণে। তাই—

২. "গিন্নীর ভাই পালিয়ে গেছে গিন্নী চ'টে কাঁই।
আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কাঁদিছেন সদাই।
কোথায় শালা শালা কোথায় কেবল ভদ্রলোক—
ডাকতে গিয়ে জিভ কেটে ভাই—ফিরিয়ে নেই চোখ।"

[শালানুসন্ধিৎসা]

৩. "আমার খোকার মাসী শ্রী অমুক বালা দাসী
মোরে দেখেই সর্বনাশী ফেলে ফিক ক'রে হাসি।"

৪. "বরের বাবা ঃ ওগো গিন্নি গিন্নী কোথায় গো
অঃ বেয়াই-এর সাথে ভিড়ে গেছ তুমি।

www.pathagar.com

এরা যেন রাধাকেষ্ট আমি মধ্যে আয়ান।"

[প্রীতি উপহার-রেকর্ড নাটকের গান]

৫. স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক ভাবির গান এরকম—
স্ত্রী—এই গাধার খাটুনির চেয়ে অনেক ভাল দাদার স্ত্রী।
পু—এই নারীর শাড়ীর চেয়ে ভাল ভোজপুরীদের দাড়ি।
মদ্দ হ'য়ে মলুম মাগো মদ্দা বিয়ে করে
ধাড়ী মেয়ে বিয়ে ক'রে নাড়ি গেল ছিঁড়ে।"

৬. "ভাই নাত জামাই—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি
তুমি বৌ এর তীর্থে ন্যাড়া হও—
মোর নাতনীর ভ্যাড়া হও।"

৭. "বিছানা আছে বালিস আছে বৌ নাই মোর ঘরে
তার বিরহে বারটা মাস কেমন ক'রে কাটে।".....
[বার মাসী—বৌ-বিরহ]

৮. "শা আর শুড়ি মিলে শ্বাশুড়ি কি হয় গো
শ্যামাপ্রেমে রাধাদের স্বামী তারে কয় গো।"

৯. "ওহো আজকে হইব মোর বিয়া
কালকে যাইব বউ নিয়া
রইবা তোমরা তা নিয়া(নি) বুঝলা গোপ্লা মুকুন্দা
হউর হউরী পাইমু কাল সুমুন্দি আর শালীর পাল"..... ।

১০. "প্রিয়ার চেয়ে শালী ভাল বাবার চেয়ে মামা
ডাইনের চেয়ে ডুগী ভাল অর্থাৎ কিনা বামা।
পাকার চেয়ে কাঁচা ভাল কাঁচার চেয়ে ফর্সা
পেত্নীর চেয়ে ভূত ভালো ভাই ছাড়ুবার থাকে ভর্সা।"

১১. "মাঝারি ছোট ও বড় মিশল আমড়া চালতা আম কাঁঠাল

www.pathagar.com

কেউ বিশাল মুটকিনী কেউ নিকপিকে সুটকিনী
কেউ উড়িয়ানী কট্‌কিনা, কেউ বাঁটকুনী, কেউ লম্বা
কেউ হাসে বিনা চেষ্টাতে [ঐ বড় শালী]
কারে দেখে যে পস্তাতে [মোর ছোট শালী]।
.....
দেখিয়া হায় রে হায় তনু-মন-প্রাণ বেসামাল।"

নীচে দুটি গানে উদ্ধৃত হ'লো—বিয়ের জ্বালা-যন্ত্রণা কত—তা নিয়ে—

১২. "দু' পেয়ে জীব ছিল গদাই—বিবাহ না ক'রে—
কুক্ষণে তার বিয়ে দিল সবাই ধ'রে
আইবুড়ো সে ছিল যখন মনের সুখে উড়তো
.....
ঘরে এল জরু দেখল গদাই
সে আর উড়তে পারে না
ভারী ঠেকে সদাই।"

এমনি আরও কয়েকটি নিছক হাস্যরসের গান—

১৩. "ওরে হুঁলোরে তুই রাত-বিরেতে ঢুকিসনে হেঁসেল
কবে বেঘোরে প্রাণ হারাবি বুঝিস্‌নে রাস্‌কেল।"

১৪. "ওরে বাবা ওর নাম নাকি পূজা
পূজার ঠ্যালা সইতে সোজা মানুষ হয় কুঁজা।"

(পূজার ঠ্যালা)।

দরিদ্র পিতার দশটি কন্যা সন্তান নিয়ে পিতা, হিমশিম খায়। তাদের পূজার উপহার [নূতন বস্ত্র] কিনে দিতে হয় ব'লে। পূজায় সস্তায় ট্রেন ভ্রমণ ক'রতে হবে। শালা-শালীদের উৎপাত আবদার আছে—তাই কবি ব'লছেন—"আসছে বছর পূজায় মাগো আমি হবো ফিরিঙ্গি। পিতা হওয়ার চেয়ে হাঁড়ি কাঠের পাঁঠা হওয়া সোজা"।

www.pathagar.com

এবার প্রেম বিষয়ক কতকগুলি হাসির গানের উল্লেখ করা যায়। এখানে রাধাকৃষ্ণের জবানীতে প্রেম সম্পর্কে কিছু হাস্যরসের অবতারণা করা হ'য়েছে।

১. "ওগো ননদিনী বল কপট নিপট কালা নিঠুর খল
তার ভয় নাই, লজ্জা শরম লইয়া যুবতীরা ধায়
খেলে সে নিঠুর খেলা চতুর চপল।"

২. "ওই পোড়া মুখে অমন ক'রে হাসি মনে সব রাই গো।"

৩. "মাথা খাস রাধে, কথা শোন কুল আর তুই খাস্‌নে।
গোকুল ঘোষের কন্যা যে তুই কুল গাছ পানে চাস্‌নে।
ও কুল গাছে বড় কাঁটা।"

৪. "যখন প্রেমের জ্বালায় অঙ্গ জ্বলে জুড়াই জ্বালা জলে
ছাতা দিয়ে মারি খোঁচা যেন সুরের বগলে।"

৫. "শ্যামা তোরে শ্যাম সাজায়ে দেখি আয়
পীত ধড়া মোহন চূড়া কেমন মানায়।"

৬. "আজকে হোরী ও নাগরী ও গিন্নী ও ললিতে।"

নজরুল ইসলাম বাংলা-হিন্দী মিশিয়ে কিছু গান লিখেছিলেন। এগুলিও রাধাকৃষ্ণের জবানীতে—

১. "আগার তুম রাধে হোতে শ্যাম
মেরি তরহা ব্যস আঠো পহরে তুম রটতে শ্যাম কা নাম।"

২. "শ্যাম সুন্দর মন মন্দির মে তুম আও আও।"

৩. "ঘরকা ভ জন কর্ লে মনুয়া ঘরকা ভজন কর্ লে
কঠিন ভওয়রভও সাগর মাহিনাম নেইয়ানে তরজলে।
মনুয়া।"

ইউরোপীয় তথা বিদেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণের প্রতি ব্যঙ্গ-

www.pathagar.com

বিদ্রূপ-কটাক্ষও—কবির কয়েকটি গানে দেখা যায়—

১. "দ্যাখো হিন্দুস্তানী সায়েব মেম রাজা ইংরেজ হারাম খোর
ওদের পোশাকের চেয়ে অঙ্গই বেশী; হাঁটু দেখা যায় হাঁটিলে জোর
আর মেয়েরা ওদের মদ্দের সাথে রাজপথে করে গলাগালি ।

কোরাস:

তৌবা তৌবা ।
দ্যাখো মেয়েরা ওদের বোরকা না দিয়ে
রেল ও জাহাজে চড়িয়া যায় ॥
তৌবা তৌবা ।
আর আমাদের মত দাঁড়ি কৈ ওদের
লাগিলে যুদ্ধ নাড়িবে কি?
সোবহান আল্লা! সোবহান আল্লা ।"

২. "কলির রাই কিশোরী কলি কা আইয়া গোরী
বেবি অষ্টিনে চড়ি চলিছে সাঁরে
ঢাকুরিয়া লেকে পিয়াকো সাথ থেকে
যাঁতে সে এঁকে বেঁকে
আধুনিক বাঁকে ।"

৩. "গান গাহে মিসি বাবা শুনিয়া শুধায় হাবা
খুকি কাঁদে যেন বাবা ফোঁড়া কাটিছে ওর ।
হাসিয়া কহেন পিসি ও দেশেতে শীত বেশী
তাই কাঁদে বাবা মিশি হি হি হি হি হৌ হৌ ॥"

৪. "টারালা টারালা টারালা টা টারালা টারা টোল্লা
নাচে শুট্‌কী শুকনো সাহেবকে নিয়ে ধরে মুট্‌কী মিস আরসোল্লা
খুরওয়ালা জুতা পরে খটাখট ঠেংরী নাড়ে
চাবুক খেয়ে জোড়া ঘোড়ায় যেন পেছলি পড়ে ।"

মুছলমান ও হিন্দু এই মহাদেশে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস ক'রে

www.pathagar.com

আসেছে । কিন্তু ইংরেজ আমলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ হানাহানি লেগেই ছিল। যদিও অনেকের অভিমত এই বিরোধটা ইংরেজ শাসকদের-ই সৃষ্টি। তাঁদের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য এ ছিল—একটা চক্রান্ত মাত্র। মুছলমান-হিন্দুর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উত্তেজনা ইংরেজ শাসনের শেষের দিকে অত্যন্ত-তীব্র হ'য়ে উঠে। নজরুলের কয়েকটি গানে তার-ই প্রতিফলন ঘ'টেছে—

১. "দাড়ি আর টুপীতে লেগেছে দ্বন্দ্ব বচন যুদ্ধ ঘোর
কে বড় কে ছোট চাই মীমাংসা কার আছে হাতে জোর।
ক্রমশঃ তর্ক বাধিল ভীষণ বচনে বেজায় দ্বন্দ্ব
সহসা মুণ্ড ছিন্ন হইল শত্রুর কৃপাণ ঘায়
তখন টুপী আর টিকি এক-ই সাথে ভূঁয়ে গড়াগড়ি যায়।"

২."বদনা গাড়ুতে মুখোমুখি বসি দিদি হ'য়েছে ভাব
বদনা চাহিছে শুকনী আর চাহিছে গাড়ু কাবাব।"

এদিকে, গোপনে গোপনে মুছলমানে-হিন্দুতে মিলন হ'য়েছে—নিষিদ্ধ খাদ্য বা পানীয়ের আসরে। হিন্দু মুছলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভণ্ডামির প্রতি কবিও কটাক্ষ ক'রেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়—সেই বহুল প্রচারিত গানটির—"দে গরুর গা ধুইয়ে"। গো-জাতি হিন্দুর পূজ্য আর মুছলমানের ভোজ্য। এই প্রসঙ্গ নিয়ে মুছলমানে-হিন্দুতে ওই দিনের বিরোধ।

গানটি এরকম:—

৩. "আবু আর হাবু দুই ভায়ে ভায়ে সদাই ভীষণ দ্বন্দ্ব
এক ভাই কালা আর ভাই অন্ধ—
টিকি আর দাঁড়ি ছেড়ে সহসা হইল দোস্ত
আবু কিনে খায় গোস্ত-কাবাব
হাবু খায় বড়ি পোস্ত।"

www.pathagar.com

৪. বিদেশী সঙ্গীত-প্রীতিও নজরুলের কটাক্ষের বিষয়বস্তু হ'য়েছে। যেমন—নাম—পাম।

"দুর্বল অঙ্গের লম্পং ঝম্পং ভূড়ি কম্পনং..... ।"

৫. ইংরেজী ভাষা-প্রীতি আর নগর-জীবন প্রতিও কবির কটাক্ষ পতিত হ'য়েছে। যেমন—

"রব না কৈলাসপুরে আই এ্যাম ক্যালকাটা গোয়িং
যত সব ইংলিশ ফ্যাসন আহা মরি কি লাইটনিং।
দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার-কম অন্ ডিয়ার গুডমর্ণিং।"

এবার তৎকালীন রাজনৈতিক দৃশ্যপটের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। নজরুল-যুগে দেশের মানুষের [তথা রাজনৌতিক নেতৃবৃন্দের] প্রধান একটি দাবী ছিল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। ওদিকে ইংরেজ সরকার তাদের বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ডেমিনিয়ন স্টেটাস-এর মর্যাদা দিতে চেয়েছিল—অর্থাৎ ছোট খাট ব্যাপারগুলি এদেশীয় কর্তৃপক্ষের হাতেই থাকবে— । বৈদেশিক বিষয়, দেশরক্ষা, অর্থ ইত্যাদি থাকবে—ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে। সেকালের কোন কোন নেতা [বা দল] এতে সম্মত ছিলেন। তাঁরা মনে ক'রতেন—এ-ভাবে একটু একটু ক'রে ক্ষমতা পেতে পেতে একদিন পূর্ণক্ষমতা অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধথীনতা পেয়ে যাবেন। এমনি ক'রেই ভারত অচিরেই পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে, সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হবে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ-ই দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিল। অর্থাৎ জনগণ আর নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'লো—মতবিরোধ দেখা দিল। নজরুল ইসলাম জনগণের পক্ষে ছিলেন। তাই তিনি ডোমিনিয়ন স্টেটাস নিয়ে একটি কবিতা (গান) রচনা করেন—

"কোরাসঃ বগল বাজা দুলিয়ে মাজা বসে কেন অম্‌নিরে।
ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাটি মা হলেন আজ ডোম্‌নীরে।
রাজা শুধু রাজাই রবে। সাগর পারে নির্বাসন

www.pathagar.com

রাজ্য নেবে দুই ভাই মিলে দুর্যোধন আর দুঃশাসন
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রবে সিংহাসনে মাত্র রাজা..... ।
.....
ভিক্ষের চাল কাঁড়াই হোক আর আঁকাড়া তুই ছালায় ভর
ঐ চিবিয়ে জল খেয়ে থাক ফলও পাবি অতঃপর ।"

প্রকৃতপক্ষে শুধু কবি-ই নন, এ-দেশের জনগণ কোনদিন-ই এরকম স্বাধীনতা কামনা করেনি। জনগণের সম্মিলিত অন্তর-দাবীর সুন্দর বাণীরূপ উপরের ওই গানটি। নজরুল তাঁর সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় (১৯২২) ঘোষণা করেন—"ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়—স্বরাজ-টরাজ বুঝিনা—এই কথাটির মানে এক এক মহারথী এক এক রকমের ক'রে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীদের অধীনে থাকবে না। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হ'লে, সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ ক'রতে হবে।[১০]

নজরুলও মনে-প্রাণে বিশ্বাস ক'রতেন যে, আবেদন-নিবেদনের থালা নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। বিদ্রোহ ক'রতে হবে—পূর্ণ স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতে হবে; প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ-এর কাছ থেকে। ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে ইংরেজ সরকার একাধিক গোল টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) ক'রেছেন; ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। কিন্তু ঐ সব বৈঠকে কোন ফল হয়নি। নজরুল এই বৈঠককে উদ্দেশ্য ক'রে লিখেন:—

"কোরাসঃ দড়াদড়ির লাগলরে গিঁঠ গোল টেবিল বৈঠকে
ঠোকর মারে লোহার ইটে এই ঠকে কি ঐ ঠকে।
ব্যাণ্ড বাজে ইংল্যাণ্ডে ঐ চলল লিভার্স এ্যাণ্ড কোং
শকুন মাতুল বল না নেমী কণ্ঠে লাউড স্পীকার চোং।
এমন মালার কাঁচকলার তোরাও পাবি ন্যাংড়া আম
সাগর মথি আনবে সব হয় সুধা নয় দই টক।"

www.pathagar.com

এখানে কবির শব্দ ব্যবহার : অনুপ্রাস যমক প্রভৃতি অলংকারের প্রয়োগ লক্ষণীয়। বাঙালা ভাষার বিশেষ বাগ্বিধির (ইডিয়ম) ব্যবহারও আছে এই গানটাতে। সেকালে প্রাদেশিক সরকারের হাতে শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের দায়িত্ব ছিল। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন পাশ হ'য়ে গেল। কিন্তু আইন পাশ হওয়া, আর তা কার্যকর করা এক কথা নয়। নজরুলের কটাক্ষ থেকে ঘটনাটি বাদ পড়েনি।[১২]

নেপথ্যে কোরাস—

"এই বেলা নে ঘর ছেয়ে
এই দেশটা ভীষণ মূর্খ ঘুচাবে এরা দেশের দুঃখ
হবে চাষারা উচ্চ প্রাইমার, ওরে আদেশের আর নাই মার।
ছুটে আয় সব ছেলে মেয়ে॥
(এই বেলা নে ঘর ছেয়ে)।"

সাইমন কমিশন সম্পর্কে কবি লিখেছেন—

"কোরাস—কি দেখিতে এসে কি দেখিনু শেষে রিপোর্টে লেখেন সাইমন

হুটো পুটি ক'রে ছুটাছুটি ঘরে বুড়াবুড়ী কাজে নাই মন
ম্যাদা দল আর উদো দল পায়ে হস্ত বুলায় হর্দম।
[প্রথম ভাগ ভারতের যাহা দেখিলেন]
[এবার দ্বিতীয় ভাগ—ভারতেকে যাহা দেখাইলেন]

কোরাস—যীশু খ্রীষ্টের নাই সে ইচ্ছে কি করিব বল আমরা
চাওয়ার অধিক দিয়া ফেলিয়াছি ভারতে বিলিতি আমড়া।
.....
ঢাক কিনে দাও হিন্দুরে—মুসলমানে বল—কর বক্‌রীদ।"

জাতিসংঘের আদিরূপ—"লীগ সব নেশনস"। এই লীগ অব নেশনস্ প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে (১৯১৮) প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল বিশ্বশান্তির

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে। কিন্তু বিশ্বে শান্তি আসেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও আবার শুরু হ'য়ে যায় ১৯৩৯ সালে। 'লীগ অব নেশন্‌স'ও কবির কটাক্ষের পাত্র হ'য়ে যায়। বিশ্বের প্রধান বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন হিংস্র প্রাণীর নামে তিনি নামকরণ করেন—এই প্রণালীতে।—যেমন ইংরেজ হ'লো সিংহ, ভারত-বর্ষ হ'লো হস্তী; ফ্রান্স হ'লো বাম, রাশিয়া হ'লো ভালুক, ইটালি হ'লো হাঙ্গর, আমেরিকা হ'লো হায়েনা, জার্মানী হ'লো ঈগল।

"কোরাস—

ব'সেছে শান্তি বৈঠক ব্যস্ত সিংহ হাঙর নেকড়ে
বৈষ্ণব তার দাদা মেষ এসে হরি বোল বলে দেখ্‌রে।
শিবা সারমেয় খটাস শকুনি দু'নয়ন লবণাক্ত
কেঁদে কয়। দাদা নামাবলী নেব আর রব নাক শান্ত।
শিশু হাসি হেসে নব যিশু বেশে এসেছেন বনমাঝ
অজিন আসন এনেছে হরিণ বসিবেন গোরা পশুরাজ

ইংরেজ সরকার তথা ইংরেজ শাসকদের প্রতি কটাক্ষ আছে—তাঁর 'সুপার বন্দনা' গানেও—এখানে নজরুলের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসেছে—বন্দী অবস্থায় কবি অনেক দিন ইংরেজের কারাগারে আটক ছিলেন—সেই জেলখানার কর্তা মশায় সম্পর্কে তিনি লিখেন—[১৪]

"তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমারি গান তোমারি ধ্যান, তুমি ধন্য ধন্য হে।
রেখেছ শান্ত্রী পাহারা দ্বারে আঁধার কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছ শিকল প্রণয় ডোরে—তুমি ধন্য ধন্য হে।"

[সুপার বন্দনা]

চাকরী-লোভী বাঙ্গালীকে কটাক্ষ ক'রেছেন নজরুল—

১. "নখদন্ত বিহীন চাকরী অধীন আমরা বাঙালী বাবু
পায়ে গোদ গায়ে ম্যালেরিয়া বুকে কাশি লপরে বাবু।"

www.pathagar.com

২. "কেরানী আর গরুর কাঁধ এই দুইই সমান দাদা
এক নাগাড়ে জোয়াল বাঁধা টানছে খেয়ে ডাল সাদা।"

ইংরেজ ব্যবসায়ীরা চা-কে কিভাবে এ-দেশে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়—তার প্রতিও কবির দৃষ্টি ছিল। চায়ের প্রতি অসক্তি, সুরার অসক্তির চাইতে কিছু কম নয়। কবি চা নিয়ে লিখেছেন—

"চায়ের পিয়াসী পিপাসিত চিত আমরা চাতক দল
দেবতারা কয় সোমরস যারে সে এই গরম জল।
চায়ের প্রমাদে চার্পক বাবা রণে হ'ল পাশ
চা নাহি পেয়ে চার পেয়ে জীব চর্বণ করে ঘাস।"

যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শাব্দালঙ্কারের বহুল ব্যবহার এই গানে লক্ষণীয়।

নজরুল-রচিত এই সব হাসির গানে কবি-মানসের বিচিত্র রূপ বিধৃত হ'য়েছে বলা যায়। প্রথম জীবন থেকেই নজরুল যেন এক মানস-সংকটের মধ্য দিয়ে দিন যাপন ক'রছিলেন—তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্য-সাধনার পরিচয় এই সংকটের মধ্যে। নজরুল সাহিত্যে যে আপাত-বিরোধিতার দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়—তার কারণ বোধ হয়—এই মানস- সংকটের ফলে সৃষ্ট। এ-দ্বন্দ্ব-সংকট থেকে নজরুল অব্যাহতি চেয়েছিলেন। আর সেজন্যেই বোধ হয়—তিনি হাসির গানের বৈচিত্র্যের মধ্যে আপন মানস-সংকট থেকে উত্তরণের চেষ্টা ক'রেছিলেন!

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

১.পাণ্ডুলিপি, ২য় সংকলন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা সাহিত্য সমিতি, ১৯৭৩, পৃ. ২৬-৩১ (১৩৭৮)।
২. রফিকুল ইসলাম। কাজী নজরুল ইসলাম, জীবন ও কবিতা, ১৯৮২, পৃ. ১০-১১।
৩. তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ (সম্পাদক মামুদ)। ১৯৬৯, পৃ. ৪৬১।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০. ৪৬০।
৫. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্য নজরুল (২য় সং-১৩৬৩), পৃ. ১২৩, ১৪৮-১৫০।
৬. আবদুল আজীজ আল্ আমান। অখণ্ড নজরুল-গীতি, (১৯৭৮ পৃ. ২৮ ভূমিকা।
৭. তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ—প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৭৩; [চন্দ্র বিন্দুঃ শ্রীচরণ ভরসা]।
৮. আবদুল আজীজ আল্ আমান। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৭।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৮।
১০. মুজফফর আহমদ। কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি-কথা, (১৯৭৩), পৃ. ২৪২।
১১. মুজফফর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
১২. এ. এস. এম. আবদুর রব; এ, কে ফজলুল হক (লাহোর)
আব্দুল আজীজ আল্ আমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬-৫২৭।
১৩. এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা।১৬শ খণ্ড (ঢাকা, ১৯৯৮), পৃ. ৭০।
আল্-অমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২-৫৩৩।
১৪. আজহার উদ্দীন খান। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
১৫. রফিকুল ইসলাম। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

www.pathagar.com